AUGUST 2022

Monthly Bulletin

VOLUME LI, NO. 8

THE ASIATIC SOCIETY
(AN INSTITUTION OF NATIONAL IMPORTANCE)
1 PARK STREET ● KOLKATA-700016

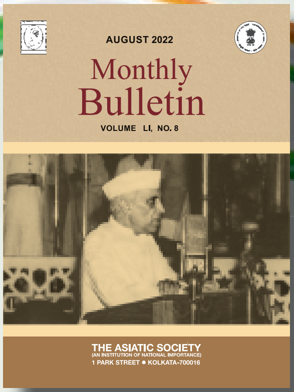

Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, delivering his 'Tryst with Destiny' speech on the eve of Independence at midnight, 14th August 1947

Contents

From the Desk of the General Secretary 1

Meeting Notice 2

Paper to be read

- আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা: পরাধীনতা ও স্বাধীনতার আখ্যান 3
  সৌমিত্র শংকর সেনগুপ্ত

President's Column

- Population, Fertility Differentials and Religion in India 7

In Memoriam

- শেষ দৃশ্যে শ্রী তরুণ মজুমদার 13
  জয়দীপ মুখোপাধ্যায়
- তাঁকে যেভাবে পেয়েছিলাম 19
  ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল

From the Treasure of a Great Poet

- একটি অপ্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীতের সুরান্তর 22
  দেবাশিস রায়

75 Years of India's Independence

- আন্দামান সেলুলার জেলের প্রথম পর্ব (১৯০৯-১৯২১) – অত্যাচার ও প্রতিরোধের কাহিনী 25
  অমিত রায়
- Sailendra Nath Ghose – The Revolutionary who could have been a Scientist 34
  Anirban Kundu

Remembering August 01

- ব্যাঙ, পেনিসিলিন এবং বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র 38
  কৃষ্ণেন্দু দেব

Remembering August 02

- Philanthropic P.C. Ray: A Relook 42
  Manas Chakrabarty

Heritage Matters

- A Note on Recent Excavation at Khana-Mihirer Dhipi (Chandraketugarh), District North 24 Parganas, West Bengal 45
  Shubha Majumder, Rajkumari Barbina and Maneesh Verma

Centenary Tribute

- সদ্যোত্তীর্ণ শতবর্ষে কথাশিল্পী বিমল কর 50
  সুব্রত ঘোষ
- বিমল কর এবং তৎকালীন যুবসমাজ 55
  তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

New Book from Reader's Choice

- প্রবন্ধসংগ্রহ: শিশিরকুমার দাশ 59
  রফিকুল হোসেন

- ***Books Accessioned during the Last Month*** 63

From the Desk of the General Secretary

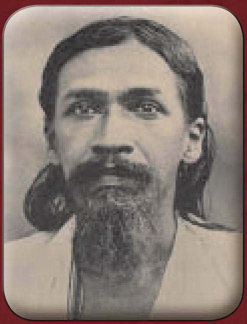

Dear Members and Well-wishers,

Let me extend to you all my hearty wishes on the occasion of completion of 75 years of India's Independence. We have planned to observe this historical event in a befitting manner with a number of programmes including a few lectures and publications. The month of August witnessed a variety of historical events, apart from our Independence Day (15.08.1947), some of which connect us to various phases of our recent history. The British Monarchy took over the administration from the East India Company on 2nd of August, 1858 while the First session of Indian National Congress was held in Bombay on 3rd August, 1885. Nearly 250 years back Maharaja Nanda Kumar was hanged on 5th August, 1775. The 9th of August, 1942 is remembered as the beginning of Quit India Movement. Another martyr Khudiram Bose was hanged on 11th August, 1908. The Boycott Movement of foreign cloth was launched under the leadership of Mahatma Gandhi on 22nd August, 1921. Netaji Subhas Chandra Bose had taken the charge of Azad Hind Fauj on 25th August, 1943. There are some sordid incidences of history also which had taken place in the month of August. For example, declaration of the First World War (03.08.1914), American Atom Bomb Blast at Hirosima on 6th August, 1945 and at Nagasaki on 9th August, 1945. Acharya Prafulla Chandra Ray and Sri Aurobindo, two great scholars and visionaries were born on 02.08.1861 and 15.08.1872. We are going to observe 150th Birth Anniversary of Sri Aurobindo very soon. Geneva Conference for World Peace of 92 countries was held on 8th August, 1955. Nobel Laureate Tagore's *Gitanjali* was published on 14th August, 1910. After Independence, the Bill for State Re-organisation received the assent of the President of India on 31st August, 1956.

Friends, we are in the midst of many memorable occasions in this month. We are also going to organize a few important lectures including the programme of observance of 'Azadi Ka Amrit Mahotsav'. Dr. Kalpana Kannabiran, eminent Sociologist and Social Activist delivered Indira Gandhi Memorial Lecture, 2021 on 20.07.2022. Professor Sudipta Sen received Sir William Jones Memorial Medal for 2021 and delivered a brief talk on 'William Jones and the Rule of Law in Late Eighteenth Century Calcutta' on 22.07.2022. A colloquium on the occasion of 250th Birth Anniversary of Raja Rammohun Roy was organised at the Society on 29.07.2022. I wish all of you will kindly join us in our effort to carry forward with the academic programmes of the Society in the months to come.

Please keep well and safe.

(S. B. Chakrabarti)
General Secretary

AN ORDINARY MONTHLY GENERAL MEETING OF THE ASIATIC SOCIETY WILL BE HELD ON MONDAY, 1ST AUGUST 2022 AT 5 P.M. AT THE VIDYASAGAR HALL OF THE SOCIETY

MEMBERS ARE REQUESTED TO KINDLY ATTEND THE MEETING

AGENDA

1. Confirmation of the Minutes of the last Ordinary Monthly General Meeting held on 4th July, 2022.
2. Exhibition of presents made to the Society in July, 2022
3. Notice of Intended Motion, if any, under Regulation 49(d).
4. Matters of current business and routine matters for disposal under Regulation 49(f).
5. Consideration of reports and communications from the Council as per Regulation 49(g).
   The names of the candidates for Ordinary Membership as recommended by the Council in its meeting held on 26th July 2022 for election under Regulation 5 (The details are given separately as an Annexure to the Notice).
6. The following paper will be read by Shri Soumitra Sankar Sengupta :
   "Anchalik Itihas Charcha: Paradhinata O Swadhinatar Akhyan"

1 Park Street, Kolkata-700016
Dated : 18.07.2022

(S B Chakrabarti)
General Secretary

আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা: পরাধীনতা ও স্বাধীনতার আখ্যান

সৌমিত্র শংকর সেনগুপ্ত
প্রাবন্ধিক

১৮৬৪ সালে বহরমপুর থেকে একটি ছোট বই প্রকাশিত হয়। শ্যামধন মুখোপাধ্যায়ের *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*। হুগলির মানুষ শ্যামধন মুন্সেফের চাকরি করতে গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। 'রাজকীয় কর্ম উপলক্ষ্যে দীর্ঘকাল' মুর্শিদাবাদে থাকার সূত্রে 'সংগৃহীত' স্থানীয় বৃত্তান্ত, পারসি তারিখ, স্টুয়ার্ট ও মার্সম্যান সাহেবের ইতিহাস বই এবং রেভিনিউ সার্ভেয়ার গ্যাসট্রেলের প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে মুর্শিদাবাদ ইতিবৃত্তটি লেখেন তিনি। শ্যামধন যাওয়ার কয়েক দশক আগেও মুর্শিদাবাদ শহর বাংলা সুবার রাজধানী; কাশিমবাজার, কালিকাপুর, ফরাসডাঙা, চুনাখালি ছিল ইউরোপীয় বণিকদের কুঠি ও আবাসস্থল। একদা বাংলার প্রধান নগরাঞ্চলের ভাঙনের ছবি চোখের সামনে দেখে শ্যামধনের মনে হতেই পারে "কোন মহাত্মার সময়ে তাঁহার মহতী কীর্তিস্বরূপ এই স্থান রাজধানী নাম ধারণপূর্বক জনসমাজে বিখ্যাত হইয়াছিল অগ্রে তদ্বিবরণ করা আবশ্যক।"

বইটির শেষাংশে গ্যাসট্রেলের প্রতিবেদন নির্ভর স্থানিক বিবরণ ছাড়া পুস্তিকাটির বিষয় নগর মুর্শিদাবাদ ও নবাব পরিবারের ইতিহাস। প্রেরণা ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে অঞ্চলচর্চার অভিমান ও অভিজ্ঞান এই বইয়ের ছিল না। বরং পূর্বসূরী কালীকমল সার্বভৌমের *সেতিহাস বগুড়ার বৃত্তান্ত* (১৮৬১) গ্রন্থটি এবং ১৮৬৪ সালে *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় প্রকাশিত 'হিজলীর বৃত্তান্ত' নিবন্ধটিকে নির্দ্বিধায় অঞ্চলকথার পর্যায়ে ফেলা যায়।

একটি সদ্যপরিচিত জেলা ও অঞ্চলের তথ্য জানার এবং অন্যদের জানানোর স্বতোৎসারিত আগ্রহই শ্যামধন ও কালীকমলকে গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। তুলনায় 'হিজলীর বৃত্তান্ত' বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক ও পুরাবৃত্ত সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত সংগ্রহে *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার সংগঠিত উদ্যোগের ফসল। *তত্ত্ববোধিনী*-র আক্ষেপ, বাংলার শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার ইতিহাস ও ভূগোল পরিশ্রমের সঙ্গে অধ্যয়ন ও শিক্ষা করেন, কিন্তু "তাহাদের বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার কোনো বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কিছুই বলিতে পারিবেন না।" এই ভাবনার থেকে *তত্ত্ববোধিনী* 'ইতিহাস সংগ্রহ' শিরোনামে আঞ্চলিক তথ্য ও বৃত্তান্ত সংগ্রহের পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনার রসদ জোগাবেন তাঁরা "যাহারা এতদ্দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কর্মোদ্দেশে অথবা অন্য কোনো কারণে বহুদিন বাস করিয়াছেন এবং তথাকার প্রাকৃতিক, সামাজিক ও পুরাবৃত্ত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।" *তত্ত্ববোধিনী*-র ইতিহাস সংগ্রহের প্রথম নিবন্ধটি

'হিজলীর বৃত্তান্ত' বিপুল শস্য ও লবণ উৎপাদক 'লোনা হিজলী'র বিবরণ। এই নিবন্ধ কোনো পাঠ্য বা পরিচিত ইতিহাস বইকে ঘিরে গড়ে ওঠেনি। স্থানবিবরণ, জনশ্রুতি, লবণ তৈরির প্রক্রিয়ার দীর্ঘ আলোচনা - সব মিলিয়ে সেটি চোখ মেলে অঞ্চলটিকে দেখেছেন এমন এক মানুষের লেখা বর্ণনা।

এই বই বা নিবন্ধ যখন লেখা হচ্ছে তখনও হেনরি বেভারিজের *বাখরগঞ্জ* লেখা হয়নি; হান্টার ভারতে এসেছেন, জেলার প্রশাসনিক চাকরি শুরু করেছেন, কিন্তু *অ্যানালস অফ বেঙ্গল* লেখা হবে আরও কয়েক বছর পরে; আরও এক দশক পর তিনি হাত দেবেন তিন পর্বে স্ট্যাটিস্টিকাল অ্যাকাউন্ট এবং গেজেটিয়ার প্রকাশের পরিকল্পনায়; আরও অনেক পরে চিন্তাশীল বাঙালি সমাজে আলোড়ন ফেলবে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধগুলি।

বেভারিজ, হান্টার এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ আনা হল কারণ বাংলা ভাষায় আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ধারা নিয়ে যে কোনো আলোচনায় অনুপ্রেরণার উৎস ও চর্চার ধরনের নির্মাতা হিসেবে তাঁদের লেখাগুলিকেই চিহ্নিত করা হয়। ফলে এই প্রশ্নটা থেকেই যায় তারও আগে বাংলাদেশের ছোট ছোট অঞ্চল নগর বা জেলা নিয়ে এই যে লেখালেখি, এর কারণ কী। এর উত্তর খোঁজার কাজ শুরু হয়েছে, ইতিহাসের শাস্ত্রীয় শৃঙ্খলায় প্রশিক্ষিত গবেষকেরা সে কাজ করছেন। এই মুহূর্তে কয়েকটি প্রাথমিক লক্ষণকে চিহ্নিত করা যাক। পূর্ণাঙ্গ উত্তর তোলা থাক গবেষকদের জন্য।

বিজয়ীর পরাক্রম বিজিত দেশ শাসনের যথেষ্ট শর্ত হতে পারে, বিজিত দেশের মানুষকে শাসনের যথেষ্ট শর্ত নয়। বিজয়ী দেশকেও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, বিজিত দেশের মানুষের কাছে নিজেকে গ্রহণীয় করতে হয়। *তত্ত্ববোধিনী*-র আক্ষেপের সূত্রে বলা যেতে পারে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার ইতিহাস, ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস আমাদের পড়ানো হয় বিজয়ীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের দায় থেকে। ইতিহাসের একটা নির্দিষ্ট ধাঁচ ও ধরনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করানো হয়। স্টুয়ার্ট ও মার্সম্যানের লেখা ইতিহাস দীর্ঘকাল আমাদের মননে রাজত্ব করে। একটা বড় ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে আমরা ঢুকে পড়ি যেখানে আঞ্চলিক ইতিহাসের জন্য এতটুকু পরিসর নেই।

সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়া অবাধ হলে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির সদর্থক উপাদানগুলোকে আত্তীকরণ করে যেভাবে প্রগতিশীল পুঁজিবাদী সংস্কৃতি বিকশিত হয় ভারত তা হতে পারেনি। সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় ব্রিটিশ শাসন হঠাৎই ছেদ আনে। একটা আনকোরা নতুন, এ দেশের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতিহীন ভূমিব্যবস্থা ও ভূমি-সম্পর্ক চাপিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষিত বাঙালির মানস বিকাশে তার প্রভাবগুলিকে অন্তত তিনটি পর্বে শনাক্ত করা যায়। প্রথম পর্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্যকে অবাধে গ্রহণ করা; দ্বিতীয় পর্বে এরই প্রতিক্রিয়ায় ভারতের অতীত ঐতিহ্য, মূলত হিন্দু ভারতের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরার চেষ্টা; এবং তৃতীয় পর্বে এই দুইয়ের সম্মেলনে আধুনিক ভারতের স্বরূপসন্ধান। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার আধুনিক ধারার যে উদাহরণগুলিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি তা মূলত এই তৃতীয় পর্বের সূচনাকালের। ইংরেজ পণ্ডিত সমাজের তৈরি করে দেওয়া ভারত ইতিহাসের কাঠামোতে আশৈশব পরিচিত গ্রাম জনপদ সমাজকে চিনতে না পারার প্রতিক্রিয়াতেই হয়তো আঞ্চলিক ইতিহাস নির্মাণের জমি তৈরি হয়।

এই দিক থেকে দেখলে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার প্রয়াসের মধ্যেই একটা স্বদেশীয়ানা আছে। দেশজ সংস্কৃতি, পরম্পরা, লোকসংস্কৃতি চর্চা, প্রত্নবস্তু ও পুথি সংগ্রহ, গ্রামদেবতার পরিচয় - যাই হোক না কেন, এই সংগ্রহ আর সংরক্ষণের পেছনে একদিকে ছিল গ্রাম বাংলার নির্ভেজাল দেশজ সংস্কৃতিকে তুলে ধরা আর অন্যদিকে সেই সব হারিয়ে যাওয়া 'ট্র্যাডিশন' উদ্ধার করা যেগুলোর সৃষ্টি ঔপনিবেশিক প্রভাবে হয়নি। (১) এ কাজ নিজেই এক স্বদেশব্রত।

উপনিবেশবাদীর নির্দেশিত ইতিহাসের প্রতিষ্ঠায় প্রতিস্পর্ধায় এভাবেই উপনিবেশের কণ্ঠস্বর গড়ে ওঠে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আঞ্চলিক সত্তার মধ্যে বাঙালির আত্মানুসন্ধানের যে ঝোঁক দেখা দিয়েছিল গত শতাব্দীর প্রথম দশকে বিশেষত বঙ্গভঙ্গ উত্তর পর্বে তা বিপুল ঢেউ হয়ে আসে। সোমশংকর রায়ের তৈরি বর্ষভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশের পরিসংখ্যান (২) আমাদের এই ভাবনাকে সমর্থন করে।

১৮৫০-৭৫	..	১৩টি
১৮৭৫-১৯০০	..	২৩টি
১৯০০-২৫	..	৭০টি

২

উপরের আলোচনা থেকে দুটি প্রাথমিক পর্যবেক্ষণকে মনে রেখে আমরা আলোচনাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাব। এক, গোড়ার দিকের প্রয়াসগুলোর চরিত্র যাই হোক না কেন ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা স্বদেশব্রতের রূপ নিচ্ছিল। এবং দুই, এই প্রয়াসগুলো বড় ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে থেকেও আঞ্চলিক ইতিহাসের পরিসর করছিল।

আঞ্চলিক ইতিহাসে পরাধীনতার আখ্যান এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন নির্মাণ হয়েছে নানা দিক থেকে। বঞ্চনার স্মৃতি কীভাবে বহু বছর পরেও সশস্ত্র আন্দোলনের জন্ম দেয় সে কথা লিখেছিলেন অমর্ত্য সেন। ১৮৪০এর দুর্ভিক্ষের সময় আয়ারল্যান্ড থেকে নদীপথে জাহাজ ভর্তি খাবার নিয়ে যাওয়া হয় ব্রিটেনের নাগরিকদের জন্য। দুর্ভিক্ষ হলে নাগরিকদের জন্য সরকার কী করবে তা নিয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। ব্রিটেনের অধিবাসীরা তার সুবিধা পেতেন কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের অংশ হয়েও আয়ারল্যান্ডের অধিবাসীরা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এই বঞ্চনা এবং অভুক্ত মানুষের চোখের সামনে দিয়ে খাদ্যবস্তু অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার স্মৃতি আয়ারল্যান্ডে সশস্ত্র বিপ্লবের অন্যতম কারণ ছিল। মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমের আঞ্চলিক ইতিহাসে আমরা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের নির্মম বর্ণনা পাই। একই সঙ্গে জানতে পারি মন্বন্তরের কালপর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব আদায় বিন্দুমাত্র কমেনি। অঞ্চলের ইতিহাসে স্থানীয় মানুষের দুর্দশা, মৃত্যু এবং তাঁদের ওপর শাসকের বঞ্চনা ও নিপীড়নের স্মৃতি যে পবিত্র ক্রোধ তৈরি করে তা ভবিষ্যতের সংগ্রামকে ইন্ধন যোগায়।

এই সংগ্রামে সাহস জোগাবে যে নায়কের মূর্তি, অঞ্চলের ঐতিহাসিকের কলমে সেই স্থানীয় নায়ক নতুন জন্ম পান। রাণা প্রতাপ এবং শিবাজীর মতো বাংলার আইকন প্রতাপাদিত্য কিংবা সীতারাম। সরলা দেবী প্রতাপাদিত্য উৎসব চালু করেছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে নায়ক করে উপন্যাস লিখেছিলেন; সতীশচন্দ্র মিত্র যশোহর খুলনার ইতিহাসে প্রবল পরিশ্রম করেন দুই নায়কের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে। প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে তাঁর পূর্বসূরীদের যাবতীয় সমালোচনা খণ্ডন করে নায়কোচিত মূর্তি নির্মাণ করতে সতীশচন্দ্রকে দুশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠা খরচ করতে হয়েছিল। তিনি আর এক স্থানীয় নায়ক সীতারামের কাহিনী লিখেছেন ষাট পৃষ্ঠা জুড়ে। 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' প্রতাপাদিত্যের এবং সীতারামের লড়াই যেমন বিধর্মী মুঘলদের বিরুদ্ধে, বারেন্দ্রভূমির কৈবর্ত নায়ক দিব্বোক ও ভীম বৌদ্ধ নরপতি রামপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছেন। শাসক বা শক্তিশালী শত্রুর ধর্ম পরিচয় এই নায়ক নির্মাণে গৌণ। দূরতর কেন্দ্রবাসী শাসকের বিরুদ্ধে প্রান্তীয় ও স্থানীয় নায়কের লড়াই এখানে আঞ্চলিক সত্তা নির্মাণের ভরকেন্দ্র।

আঞ্চলিক ইতিহাসের পথে হাঁটতে হাঁটতে স্বাধীনতার সংগ্রামের সংগঠিত পর্বের বিভিন্ন ধারার আঞ্চলিক প্রকাশও চোখে পড়ে। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের কথা খুবই পরিচিত। কিন্তু ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের সময় বীরভূমের ঘটনা আঞ্চলিক ইতিহাসের বাইরে খুব বেশি পরিচিত নয়। আন্দোলনের মূল দাবিগুলোর সঙ্গে যখন স্থানীয় খাদ্যশস্যের অভাব এবং চালের দামের মতো স্থানীয় দাবিগুলো যুক্ত হয়ে যায়, গণ অংশগ্রহণ অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পায়। বোলপুর শহরে আন্দোলন জঙ্গি চেহারা

নেয়। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হয়। আন্দোলনকারীদের মধ্যে আদিবাসী জনতা ছিলেন। তাঁদের চালানো তীরে পুলিশ আধিকারিক ঘায়েল হয়, আর পুলিশের গুলিতে একাধিক বিক্ষোভকারী মারা যান। বোলপুর সন্নিহিত গ্রামগুলিতে পিটুনি কর বা পিউনিটিভ ট্যাক্স বসে। এই ঘটনার স্মৃতি স্থানীয় মানুষের স্মৃতিতে এতটাই প্রবল যে তাঁরা এই ঘটনার ছয় দশক পরেও স্বাধীন দেশের সরকারের কাছে সেই পিটুনি করের টাকা সুদ সমেত ফেরত দেওয়ার আর্জি জানান। একটি সংগঠিত সর্বভারতীয় আন্দোলনে স্থানীয় দাবি যুক্ত হয়ে আঞ্চলিক স্তরে ভিন্ন ভিন্ন চেহারা নিতে পারে এবং এই আঞ্চলিক তারতম্যের ছবি অঞ্চলের ইতিহাসের মধ্য থেকেই উঠে আসে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি পরিপূরক ধারা কৃষক আন্দোলন। দেশের এবং রাজ্যের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে তার যেমন গুরুত্ব, আঞ্চলিক তারতম্যের সূত্রে স্থানীয় ইতিহাসেও তার আলাদা জায়গা। বীরভূমের লাঙলহাটা বিলের পার্শ্ববর্তী গ্রামের কৃষকদের আন্দোলন, মুর্শিদাবাদের হিজল বিল বা নওদার কৃষকদের আন্দোলন হয়তো কেন্দ্রীয় স্তরের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে বড় জায়গা পায় না। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালেও কৃষক চৈতন্যে তার প্রভাব এতটাই যে আঞ্চলিক ইতিহাসের পেশাদার এবং অপেশাদার দুই ধরনের চর্চাকারীদের কাছেই তা গবেষণার বিষয় হয়ে থাকে।

সব শেষে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার এবং সে উল্লেখের সূত্র আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় স্বদেশব্রতের নিরন্তর উপস্থিতি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে সুধীর কুমার মিত্রর মতো ঐতিহাসিকেরা যখন ক্ষেত্রসমীক্ষা করছিলেন, তাঁদের লেখায় দেখতে পাই স্থানীয় স্তরে একটি সমবায় তৈরি হওয়া, গণ উদ্যোগে বিদ্যালয় বা গ্রন্থাগার তৈরি হওয়ার ঘটনাগুলিকে তাঁরা কত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করছেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যখন তাঁদের বই প্রকাশিত হচ্ছে, কিংবা যখন পূর্বপ্রকাশিত কোনও বইয়ের নতুন সংস্করণ তৈরি হচ্ছে, তখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা বা নদী পরিকল্পনার কথা সেখানে জুড়ে যাচ্ছে। হয়তো স্বাধীনতাস্পৃহার সঙ্গে ততদিনে নতুন দেশ গড়ার স্বপ্ন আঞ্চলিক ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। পরাধীনতার কালের স্বদেশব্রতের কাহিনীর সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল স্বাধীনতার আখ্যান।

তথ্যপঞ্জী

(১) শেখর ভৌমিক: 'যোগেশচন্দ্র, রামানন্দ, সত্যকিঙ্কর ও এক আঞ্চলিক সত্তার নির্মাণ'; *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, কার্তিক-পৌষ ১৪১২

(২) Somshankar Ray, *The Lay Chroniclers of Bengal* One World Book, Kolkata, 2021, p.150

President's Column

Population, Fertility Differentials and Religion in India

In a recent declaration, the Union Minster of Law and Justice has declared that the Government of India is contemplating to bring a new law on Population Policy in India. While appreciating the intention, one must be very cautious in trying to 'regulate' the population picture in India with the help of laws. The disastrous experience of 'nashbandi' during the Emergency period in India has to be kept in mind before any further attempt is made to introduce a law aimed at changing the demographic profile in India.

No doubt, the population figures in India are alarmingly high. The estimated population of India in 2022 stands at 141 crores, which in the year 2020, was 138 crores. Let us look at the trajectory of population growth in India since 1951, which was the first Census year after independence. In 1951, the population was 36 crores, in 1961 it was 42 crores which in 1971 increased to 53 crores while in March, 1981, it became 66.5 crores. In March 2011 the population was estimated at 121 crores with a decadal growth rate of 17.70%. In 2001, (14th Census) it was 102.8 crores with a decadal growth rate of 20.5% whereas it was 84.6 crores in the 1991 Census. The above figures show the abnormal growth of India's population over the years. If this rate of growth continues, India will have the inglorious distinction of being the most populous country of the world as it is projected to surpass China within the next 2/3 years. In 2022, the Chinese population stands at 142.6 crores. To have an idea of the mega picture, the UN. Department of Economic and Social Affairs, Population Division, projects that by Nov, 2022, the world population will reach 800 crores, it will reach 850 crores by 2030 and to 970 crores in 2050. But happily, the positive picture is that the world population is now growing at its slowest rate since World War II, though 46 least developed countries are the fastest growing in terms of the population and they are expected to double in the next 3 decades.

Yet, the situation is not so dismal as it appears in the first sight. Even if we exclude the productive capacity of land which has increased manifold within this period, yet there are some redeeming features within the demographic situation itself which we shall presently analyse and which is the objective of this present write up.

Three Elements of Demography

There are three elements of primary importance creating its impact upon the demographic situation in a country. These are : migration; IMR or infant mortality rate and the natural increase of population

as evidenced by TFR or Total Fertility Rate. Internal migration, i.e., migration from one part of the country to another, including rural to urban migration or rural to rural migration has a tremendous impact on demographic redistribution of population and which is the major cause of the recent spurt in urbanization. But it does not significantly affect the total number of population of the country. But, on the other hand international migration, including cross border migration, does affect significantly the population structure of a country. The partition of the country and the forced migration of millions of the uprooted people from across the border, which occurred in waves of migration for decades, has significantly altered the demographic composition of the country, both in terms of number and in terms the linguistic and regional character of such migrating population. The recent addition of a religions dimension to such migrating population by the party in power at the Centre and the attempt to frame a law to identify, isolate and evict such people has caused considerable tension in the body-politic.

The second area affecting the population structure of a country is the mortality rate and life expectancy rate of the people - both male and female - in our country. Death rate is that which is measured within a specified time interval for a certain population. There is the crude mortality rate as indicated above, age specific mortality rate which counts only deaths in specific age groups, sex specific mortality rate, maternal mortality rate, under 5 mortality rate and infant mortality rate. Each of these aspects has considerable bearing on the demographic structure of our country. The available data on life expectancy rate may be cited as an example. The life expectancy rate in India as in 2019 was 69.66 years which is a phenomenal increase from 40 years in 1960 and 55.81 years in 1980, but which is still way behind 78-79 years in the United States (2019). 79.9 years in China (2019). 82.05 years in Canada (2019), 81.20 years in UK (2019) or 84.36 years in Japan in 2019. So, though India's life expectancy rate has experienced huge jump over the years, there is still much to realize in this respect. It can be stated that India is high on population but low on development indicators.

Again we can take the example of Infant Mortality Rate (IMR), which is the number of death of children within one year of birth per 1000 people. It is a very important development indicator as the IMR is not only a result of medical factors such as health infrastructure, institutionalized births, antenatal care, maternal health, post natal care, immunisation etc. but also of deeper social problems like malnutrition and sanitation. A longitudinal analysis will show that India's IMR has considerably improved. In 2020, infant mortality rate in India was 29.07 per 1000 live births. Over the years, it has sharply decreased. Data show that in 1971, i.e., 50 years earlier, the IMR was 139.19 deaths per 1000 live births; in 1951, it was 185.67 deaths; in 2001, it was 63.33, and in 2011 it was 41.99. Since 2011, IMR fell by 33.94% upto 2020. But there is a wide divergence in the IMR rates across states. UP has recorded the highest IMR of 50, while Kerala has registered the lowest - just seven, as in 2018. In 2021, MP had an IMR of 48, according to the latest data of the Registrar General and Census Commissioners of India. There is also a gender discrimination in the matter as female infants die more than the male infants. But that is a different area of analysis.

Fertility Structure and Fertility Rate

The cumulative impact of the decline in mortality rate, IMR, MMR and the like and the increase in the life expectancy rate as

indicated above, must have to be studied along with the fertility structure of the country. In fact, it has been the experience of all the developing countries - India included - that a significant improvement in the health infrastructure has an immediate impact on the death rate which declines sharply but the birth rate does not decline correspondingly which results in the huge initial increase of the population. The balancing between the death rate and the birth rate takes time and the interim period is a large scale destabilization. This is a well known demographic law.

With this proviso, let us look at the fertility structure of our country. Fertility rate means the number of children born per women in their reproductive age. In 2022, the overall fertility rate in India was 2.159. Here also, a longitudinal analysis will show that there has been a sharp fall in this area over the years. We can mention here the decennial figures. In 1951, it was 5.90, 1961—5.89, 1971—5.53, 1981—4.79, 1991—4.00, 2001—3.27, 2011—2.55 and 2021—2.17. As the data indicate, the fall is sharper in later years than in previous years.

So, it is found that the TFR has declined, for example from 2.2 in 2015-16 to 2.0 in 2019-21. The National Family Health Survey-5 (NFHS-5) conducted over two years starting from 2019 show that the TFR of 2 is currently below the replacement level of fertility of 2.1 children per woman. "Replacement level fertility represents the level at which a population exactly replaces itself from one generation to the next, thus leading to zero population growth if the level is sustained over a sufficiently long period."

But the disaggregated data on fertility structure in India do not show an equally optimistic picture. There are wide regional discriminations, urban-rural discriminations, age group discriminations as far as the fertility rate is concerned. This is apart from the socio-economic discrimination, community wise discrimination and discrimination based on educational level, income level and social standing level. This later part we will take up in the next section. But as far as the statewise discrimination is concerned, NFHS-5 data indicate that in a majority of Indian states, fertility rate has fallen well below the replacement level of 2.1 but in a number of other states, the more populous states in particular, it is still above the replacement level. Thus, in Bihar, the overall TFR is 3.0 with fertility rate in urban areas being 2.4 and that in rural areas is 3.1. In UP, the overall TFR is 2.4 with 1.9 in urban areas and 2.5 in rural areas; in Jharkhand, the overall TFR is 2.3 with 1.6 in urban areas and 2.5 in rural areas; in Rajasthan it is 2.1 in rural area whereas 1.7 in urban areas; in Meghalaya the overall TFR is 2.9 with 1.6 in urban areas and 3.3 in rural areas. On the positive side, we can mention the case of West Bengal where the overall TFR is 1.6 with 1.4. in urban areas and 1.7 in rural areas. Punjab has the overall TFR of 1.6 with 1.6 in urban areas and 1.7 in rural areas or in Kerala with over all TFR being 1.8 with urban and rural areas having the same ratio. As reported in the Economic Times, as on date, 13 States and 2 UTs have so far achieved population replacement level. That indicates a significant progress of population control measures.

Fertility Differentiation and Religion

The more delicate, touchy and politicised issue is the issue of fertility differentiation and the supposed impact of religion on fertility differentiation among various religious communities in India. The issue is touchy in view of the contemporary politicisation of religion. The contention is that fertility rate of the Muslims as a community is more and if this situation continues, there is a danger of Muslims

outnumbering the Hindus, at least in selected pockets, so that there is a danger of further dismemberment of the country. This argument needs a detailed analysis and let us look into it with reference to officially available data. But, at the outset, it must be emphasized that the various religious groups in India, specially the Hindus, Muslims and Christians are not homogeneous groups. There are so many subdivisions among them widely differing from each other on the basis of socio-economic indicators. For example, the SCs and STs, besides a large number of OBC groups are a part of Hindu community. Similarly, among the Muslims, there are Sunnis, Shias, Bohras and many other sects or cultural groups. So, studying socio-economic differentials in India at the level of religious aggregation is somewhat simplistic. With this proviso, let us look at religious community wise distinction in terms of their percentage to the total population.

Distribution of Population by Major Religions

Census	Hindus (includes SCs, STs)	Muslims	Christians
1981	(82.6%)	(11.4%)	(2.4%)
	(549.78 millions)	(75.5 millions)	(16.17 millions)
2011	79.8%	14.2 %	2.3 %

So, the Hindus make up 79.8% of India's population and Muslims account for 14.2%; Christians, Sikhs, Buddhists and Jains together account for the remaining 6%. Between 1951 and 2011, the share of Muslims in India grew by about 4% while the share of Hindus declined by about 4%. If we look at the growth rate of religious groups in the Census 2001-2011, we find that the overall growth rate of the population was 17.7%. Religion wise growth rate was Hindus 16.8%, Muslims 24.6%, Christian 15.5%, Sikhs 8.4%, Buddhists 6.1% and Jains 5.4%. But on the other hand if we compare this growth rate with that of the previous Census (1991), we find that the growth rate had come down sharply in the case of all the religions communities. The growth rate of the Hindus fell down from 24.60% to 16.76%, for the Muslims the fall was more sharp from 29.52% to 24.60%.

Decline in Fertility Rate

This religious composition in India is closely related with the changing fertility rate of the different religious groups. As already indicated, Total Fertility Rate (TFR) is the total number of children an average woman would have in her life time. All the available data show that India's fertility rate has been declining rapidly in recent years. Today the average Indian woman is expected to have 2.2 children in her life time, a fertility rate that is higher than rates in many economically advanced countries like the United States (1.6) or Bangladesh (2.01) but much lower than India's in 1992 (3.4) or in 1950 (5.9).

Religion wise, every religious group has seen its fertility rate falling drastically, including the majority Hindu population and also among the Muslim, Christian, Sikh, Buddhist and Jain minority groups. Among the Muslims, for example the TFR has decined dramatically from 4.4 children per woman in 1992 to 2.6 children in 2015. Comprehensive data in this respect are available in the NFHS-5, as done in 2019-21. Muslims still have the highest fertility rate (2.6), followed by Hindus at 2.1. Jains have the lowest fertility rate (1.2). The general pattern is largely the same as it was in 1992, when Muslims had the highest fertility rate of 4.4 compared to 2.6 in 2015. Hindu woman had an average of 3.2 children in 1992, a figure that fell to 2.1 in 2015. So,

the fertility gap between Muslim and Hindu women shrank from 1.1 to 0.5 over the years.

So, as the overall population growth has slowed considerably, especially since the 1990's, the growth among Hindus also slowed from a high of around 24.1 to about 17% in the 2000s, among the Muslims it slowed to around 25% and among the Christians it dropped to around 16%. So, the Muslims who had and continue to have, the highest fertility rate, have also experienced the sharpest fall in fertility.

But religious demography of Indian States and UTs are more complex than the overall national level pictures as stated above. Religious groups live in a wide variety of local contexts that are not apparent in the national patterns. As far as the Hindus are concerned, they have declined modestly as a share of the population. Muslims have generally maintained their population shares within States or increase them modestly. For instance, Muslims grew as a share of West Bengal's population by 1.8 percentage points, overall, in West Bengal (population 91 millions) the Hindu share decreased by 2 percentage points to 71% and the Muslims increased to 2 points to 27%. District wise distribution of this increased share and the role of cross border migration in this respect has become a political hot spot. The data in this respect needs to be analysed critically.

Religion Does not Determine Fertility Pattern

So, as far as the religionwise fertility pattern is concerned, it is apparent that the fertility gap between the Hindus and Muslims is narrowing. But though the gap is narrowing, Muslims have still the highest fertility rate of any religious group - an average of 2.9 children per woman, which is well above the replacement level of 2.1, but again, on the other hand, down from 4.3 in 1990-95. The question then is, is this comparatively higher fertility rate because they are Muslims by religion or is it because Muslims - as compared to other religious groups - are low on socio-economic development indicators? The available data would lead us to conclude that high fertility is mostly a result of non-religious factors such as levels of literacy, employment, income and access to health services. The current gap between the two communities is because of Muslims' disadvantage on these parameters. In that sense, one can as well make the statement that development is the best type of contraceptive which one can think of.

Disaggregated data on some socio-economic and demographic characteristics of population according to religious affiliation in India are hard to find. They have got to be collated from different official data sources. The NFHS-5 National Report, submitted in May 2022 provide important information on demographic characteristics of the population, fertility, family planning, infant and child mortality within its broad framework of quest on Sustainable Development Goal (SDG) indicators. But community wise classification of these data is hard to find there. But the 43rd round of NSSO data collected during 1987-88, analysed comprehensively the socio-economic conditions of different religious groups on the basis of such indicators as land ownership, occupation, worker participation rate, literacy, rural-urban divide in occupational pattern and the like. On a comparative basis, these data show that Muslims are mostly self-employed and their share in regular paid employment is low; the work participation of Muslim females is extremely low; the land holding is relatively better among the Hindus than the Muslims; Muslims

work on non-agricultural occupations in substantial portion in rural areas; they are least educated when compared with Hindu and Christian population in India–this is particularly true of Muslim women; the Monthly Per Capita Expenditure (MPCE) of the Muslims is low compared with the Hindus. Thus on the whole, the Muslims are comparatively socio-economically worse off in all parts of the country.

It is worthy to note here one recent comment made by an immediately previous Union minister for Minority Affairs, MA Naqvi, where he said, 'Population explosion is not the problem of a religion but of the entire country. Increasing this problem by making religion a security cover is neither in the interest of the country nor society." (TOI. 13.7.22).

Sources :

1. Relevant data in this write-up have been collected from Census Reports; NFHS-5 Report; NSO (formerly NSSO) various Rounds; UN World Population Prospects, 2022; World Bank Report 2021; Population Reference Bureau 2021; PEW Research Centre Report.

2. Abusaleh Shariff - 'Socio-Economic and Demographic Differentials between Hindus and Muslims in India' in *EPW,* Nov. 18. 1995.

3. David Mandelbaum - *Human Fertility in India* OUP, 1974.

Swapan Kumar Pramanick
President

শেষ দৃশ্যে শ্রী তরুণ মজুমদার

জয়দীপ মুখোপাধ্যায়
চলচ্চিত্র পরিচালক

ঐ দূরের এক দেশ, যেখানে নীল জোছনারা আলো বিলায় রুপোলি রঙের পেখম মেলে। সে দেশে বুড়ি মা নিরন্তর চরকা কাটে, সে দেশে ভরা পূর্ণিমার দিনে রুটিকেও ঝলসানো লাগে। সে দেশ তো কল্পিত এক সৌন্দর্য, আদর্শভূমির এক প্রতীকী রূপরেখা। তাই সে দেশে বাড়ি যদি থাকে একটিই, সদ্য প্রয়াত পরিচালক শ্রী তরুণ মজুমদারের মতো ক্লাসিক্যাল যুগের শিল্পীদের বুননে, 'চাঁদের বাড়ি'-র সেই বাড়ি বারোয়ারি এক আনন্দ পরিবেশক, সে বাড়িতে গান থাকে "চাঁদের হাসির বাঁধ" ভেঙে তোলপাড় করা হৃদয় উৎস থেকে, সে বাড়িতে আদর্শবান শিক্ষক ও বয়স্করা সম্মানিত সদস্য, যাঁরা মূল্যবোধের প্রবহমান স্রোতে অকৃত্রিম অবিচল স্বকীয় সত্তায়, সুন্দর মনের কত শত চরিত্র, যাঁরা ভালোবাসার কাঙালপনায় ভরিয়ে তোলেন গৃহস্থের সাজানো সংসার, পেছনের বহু বছরের ফেলে আসা অভ্যেস, কতিপয় নীতিগত পরম্পরা আর প্রেম, হাসি, মজা, সুর। সেই বাড়ি, যার খোঁজে আজও পৃথিবী উথাল পাথাল, সে বাড়ির ঠিকানার সন্ধান বারবার দিয়ে গেছেন তরুণ মজুমদার।

শুধু মধ্যবর্তী সিনেমা পরিচালক হিসেবে বা প্রতীকী আদর্শভরা, মূল্যবোধ ও সুস্থ রুচি এবং সংস্কৃতিবোধ দিয়ে অথবা মনোরঞ্জক সুখী গৃহকোণের নাট্য ও চিত্রের প্রায়োগিক উপস্থাপনা বা এদেশী, প্রবাসী, শহর, নগর, মফস্বল বা একদম নিখাদ গ্রাম পর্যালোচনা করা তরুণ মজুমদারকে আমরা দেখে একরকমের আলপনা এঁকেছি। কিন্তু শিল্পী হিসেবে সোচ্চারিত আগুনের স্তূপের হৃদয় আমরা কি অনুসন্ধান করতে প্রয়াসী হয়েছি? আমরা কি তাঁর ছবিতে সিনেমাভাষার স্বীকৃত নান্দনিক ব্যাখ্যা খোঁজার প্রয়াসী হয়েছি? অথবা মূল্যায়নের? পরিচালক গৌতম ঘোষ কদিন আগে একটি লেখায় বলেছেন, - ফিল্ম সোসাইটির এক শ্রেণীর দর্শক ও কর্মীরা একটা রেখা টানতে গিয়ে তরুণ মজুমদার, রাজেন তরফদার, অসিত সেন, অজয় কর, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম চৌধুরীদের মত পরিচালকদের ছবিগুলোকে কিছুটা হয়তো অনাদরই করেছেন। অথচ, আজ যাঁরা পরবর্তী প্রজন্ম, তারা অন্তত জানে, আমাদের জন্যে, ভবিষ্যতের জন্যে, কী রেখে গেলেন, কী–ই বা দিয়ে গেলেন এই সব বাংলা ছবির ক্লাসিক্যাল যুগের শিল্পী সদস্যরা।

একেকজন কিংবদন্তীর প্রয়াণ হয়,

অনেক অকথিত ইতিহাসক্রমও কালের নিয়মে হারিয়ে যায়। পঞ্চাশ দশকের বাংলা সিনেমার বিবর্তনের সাক্ষীতে, কলকাতা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি যে সিনেমাশিল্পীদলের সৃজনকাব্যে মুখরিত হয়ে উঠেছিল, তার শেষ সদস্য শ্রী তরুণ মজুমদার (১৯৩১-২০২২)-র মৃত্যুতে শোকাহত বঙ্গবাসী। বড় ভাষাহীন। এখন অনুভব করা যাচ্ছে হৃদয়ের কোন অন্তঃস্থলে তরুণবাবু তাঁর সুচারু শিল্পীর ব্রাশস্ট্রোকে রাঙায়িত করে দিয়ে গেছেন ক্ল্যাসিক কিছু ছবির পটভূমি।

ক্ল্যাসিকাল সিনেমা সময়কে সঙ্গে নিয়ে আধুনিক হয়েছে। স্টুডিও-সিস্টেমে বর্ণিত ছায়াচিত্রের ঘেরাটোপের মধ্যে সৃষ্টির জটিল পদ্ধতিতে নির্মিত সেলুলয়েডের ছবিগুলো স্বর্ণযযুগের এক অনাবিল প্রাপ্তি। মনন আর বুনন - সরল, সরস, সুন্দর। প্রখ্যাত অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, তাঁদের সময়ে ছবিগুলো সব সাদা-কালো, কিন্তু টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ার মানুষগুলো সব রঙীন ছিল। সত্যিই তো, অমন সব গুণী মানুষজনের প্রাণখোলা বিচরণে আমাদের স্টুডিও পাড়া যেন এক স্বপ্নপুরী। তখন সিনেমাযুগ, সেলুলয়েডের যোগ। মানুষ কম, ভিড় কম, কর্মী কম, কিন্তু স্বপ্ন অনেক। এখনকার ডিজিট্যাল ভিডিও যুগে এই পরিবেশ অনেকের কাছেই অকল্পনীয়। সাতটি দশক পেরিয়ে সেটা মিঠে গল্পের নস্ট্যালজিয়া হিসেবেই শুধু ভাবলে, তরুণবাবুদের সিনেমাজীবন ও কীর্তি খোঁজার পথ দুরূহই হয়ে ওঠে।

পঞ্চাশের বাংলা। সদ্য স্বাধীন দেশে সবাই তখন স্বপ্ন দেখছেন নতুন কিছু গড়বার। দেশ গড়বার। বাংলা সিনেমায় তখন স্বর্ণযুগ। তার দশক দুয়েক আগে আমাদের সাথে স্টুডিও পাড়ার পরিচয় ঘটেছে দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতিন বসু, সায়গল, ধীরাজ ভট্টাচার্য, মধু বসু, সাধনা বসু, কানন দেবী, পঙ্কজ মল্লিক, রাই চাঁদ বড়াল, দুর্গাদাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রবীন মজুমদার এবং এমন অনেকের সাথে, যাঁরা বাংলা সিনেমাকে একটা দিক নির্ণয় করতে সাহায্য করেছেন, কুঁড়ি থেকে ফোটা ফুলে পর্যবসিত করেছেন। পঞ্চাশের দশক একটা transition এর দশক, কলকাতার বুকে যার পুনরাবির্ভাব আবার ঘটেছিল সত্বরে। পঞ্চাশের এই দশটি বছর বাংলা সিনেমায় ক্লাসিক যুগের সূচক। 'স্টুডিও পাড়া'য় গড়ে ওঠা এলাকাগুলিতে এঘর ওঘর চলচ্চিত্র কর্মী, কলাকুশলী, শিল্পী, লেখক, গীতিকার, সুরকার, পরিচালকদের চাঁদের হাট। বিমল রায়ের "উদয়ের পথে" বেশ সাহস দিয়েছিল নব্য ধারার চলচ্চিত্রকারদের। ক্লাসিক যুগের সব শিল্পীদেরই উত্থান এই পর্যায়ক্রমিক ইতিহাসের ধারায়, ওই পঞ্চাশের মধ্যগগনে। বাংলা ছবির রাশভারী পরিচালকেরা এই পঞ্চাশ দশকেই ইতিহাসে লিখে গেছেন পরপর সব মহাকাব্যিক সিনেমা শুরুর গল্পস্রোত – 'ছিন্নমূল' (১৯৫১; নিমাই ঘোষ), 'নাগরিক' (১৯৫২, ঋত্বিক ঘটক), 'জিঘাংসা' (১৯৫১; অজয় কর), 'অঙ্কুশ' (১৯৫৪; তপন সিনহা), 'রাতভোর' (১৯৫৫; মৃণাল সেন),'চলাচল' (১৯৫৬; অসিত সেন), 'অন্তরীক্ষ' (১৯৫৭; রাজেন তরফদার) এবং 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার' সম্বলিত অপু ট্রিলজি (১৯৫৫-১৯৫৯; সত্যজিৎ রায়)। বাংলা সিনেমার ক্ল্যাসিক যুগের যাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গল্প বলার বা কাহিনী বিধৃত করার ধরণ, নিজের ব্যঞ্জনায় উপস্থাপনা করার বৈচিত্র্যগত ফারাক, প্রকাশভঙ্গী, এসবই প্রতিটি পরিচালকের ছবিকে একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র্য এবং একক করে তোলে।

১৯৫৮ সালে তরুণ মজুমদার তখন বছর সাতাশের যুবক। তার কয়েক বছর আগে থেকেই তিনি সিনেমার সাথে নানা প্রকারে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। "তরুণ" তরুণ মজুমদার রসায়ন শাস্ত্রে স্নাতক হবার পর মনের ইচ্ছে এক আত্মীয়ের সহায়তায় স্টুডিও পাড়ায় পা রাখলেন। তখন অনেকেই, রসায়ন শাস্ত্র পড়ে সিনেমা ল্যাবরেটরিতে কাজের জন্যে যোগাযোগ

করতেন। পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ও তাই-ই করেছিলেন। তরুণ বাবু চাকরি পেলেন অ্যাপ্রেন্টিস-এর। রূপশ্রী স্টুডিওতে তখন অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের মতো নামী পরিচালকেরা কাজ করছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে টেকনিশিয়ানদের একাংশের সাথে তরুণ বাবুদের মতান্তর হয়। ফলে ঐ চাকরি তিনি ছেড়ে 'অনুশীলন এজেন্সি' নামে এক সিনেমা পাবলিসিটি অফিসে সৃজনশীল কর্মী হিসেবে যোগ দিলেন।

বিখ্যাত পরিচালক দেবকী বসু তার "পথিক" ছবিটি তৈরি করলেন ১৯৫৩ সালে। এই ছবিটির পাবলিসিটির মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন তরুণ মজুমদার। ছবিটির পাবলিসিটিতে তার বৈচিত্র্যময় সৃজনশীল ডিজাইনগুলো মুগ্ধ করেছিল সিনেমা সম্রাজ্ঞী অভিনেত্রী ও 'শ্রীমতী পিকচার্স'-এর কর্ণধার কানন দেবীকে। 'শ্রীমতী পিকচার্স'–এর ব্যানারে কানন দেবীর স্বামী হরিদাস ভট্টাচার্য তখন ব্যস্ত তাঁর 'নব বিধান' ছবিটির শুটিংয়ে। পায়ে পায়ে জড়িয়ে গেলেন তরুণ বাবু, ঐ ইউনিটের সাথে। টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ার শেষ মাথায় শেষ স্টুডিও ছিল কানন দেবীর, ক্যালকাটা মুভিটোন। ওখান থেকে পায়ে হাঁটা পথে নিউ থিয়েটার্স। আর তখন স্টুডিও পাড়ায় আজকের মত ভিড় ছিল না, সিনেমা প্রেমী ও কর্মীর সংখ্যা হাতে গোনা। পুরো স্টুডিও পাড়া একটা পরিবারের মতো ছিল। তরুণ বাবুর উপস্থিতি সেই স্টুডিওপাড়াকে সমৃদ্ধতর করেছিল। ফলে অচিরেই নিউ থিয়েটার্স-এর বিভিন্ন জ্ঞানীগুণীজনদের সাথে সৌহার্দ্য গড়ে উঠল তরুণ মজুমদারের। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রবাদপ্রতিম বীরেন সরকার, জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ বা কমল দাশগুপ্তর মত বিশিষ্টজনেরা। কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলেন তরুণ মজুমদার, নিজে ছবি করবেন, এমন স্বপ্ন কি অবশেষে সফল হতে চলল?

'অগ্রদূত' তখন এমন এক পরিচালক গোষ্ঠী যেখানে বিভূতি লাহার মত অতি দক্ষ ক্যামেরাম্যানই শুধু জড়িয়ে ছিলেন না, শৈলেন ঘোষাল, নিতাই ভট্টাচার্য, যতীন দত্ত ও বিমল ঘোষের মতো সুদক্ষ টেকনিশিয়ানদের সঙ্গী করে একের পর এক হিট ছবি উপহার দিয়েছিলেন। সিনেমাকে যদিও বলা হয়, "director's media", তবু একসাথে সু-উচ্চ মনের ও মানের টেকনিশিয়ানদের সাথে থাকলে গোষ্ঠী - ইউনিট হিসেবে ভাল কাজ হয়, সেখানে হয়তো কোন বিশেষ পরিচালকদের আলাদা করে স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় না, তবে একটা টিম হিসেবে গড়ে ওঠে। তরুণ মজুমদারের মতোই সমকালীন আর দুই পরিচালক - শচীন মুখোপাধ্যায় ও দিলীপ মুখোপাধ্যায় এরকমই একটি common platform এর সন্ধানে ছিলেন, যেখানে একটি গোষ্ঠী হিসেবে তাঁরা কাজ করতে পারবেন। 'যাত্রিক' এর জয়যাত্রা শুরু হলো। ১৯৩৪-এর হলিউডের ফ্র্যাঙ্ক কাপরার 'ইট হ্যাপেনড ওয়ান নাইট'-এর মূল গল্পের কাঠামো ধ'রে প্রথম ছবি করার উৎসাহে, তিন তরুণের একটি দল টালিগঞ্জের স্টুডিও ফ্লোরে পা দিয়েছিলেন। ১৯৫৯ এ উত্তম সুচিত্রার ব্লক ব্লাস্টার সুপারহিট ছবিটি তৈরি হলো 'চাওয়া পাওয়া', 'যাত্রিক' গোষ্ঠীর প্রথম নিবেদন। সেলুলয়েডের রীল-ঘোরা ঢাউস ক্যামেরা, বড় বড় ভারী লাইট আর লেন্সের সামনে বাঘা সব যুযুধান অভিনয়কারীরা!

সিনেমা নির্মাণ ও পরিচালনা কোন অলস-ভূমির ওপর গোলাপ চারা ফোটানো নয়, সেটা যাঁরা ছবি পরিচালনা করেন, তাঁরাই বোঝেন। তরুণ বাবুরাও বুঝেছিলেন। 'আলোর পিপাসা', 'কাঁচের স্বর্গ' বা 'পলাতক' অবধি যাত্রিক গোষ্ঠী দৌড়লেও একটা সময় এসে তরুণ মজুমদার একক পরিচালক সত্তা হিসেবে কাজ শুরু করতে হল। আমরা পেলাম এমন এক পরিচালককে, যিনি চিরকাল নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক আদর্শ, মানবতাবাদ এবং সীমাহীন আশাবাদ নিয়ে জীবনের প্রতিকূলতার সাথে

লড়াই করার সৃজনশীল চেতনার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছিলেন। সেই দিন থেকে যে পথ চলা শুরু হয়েছিল তরুণ মজুমদারের, তারপর সিনেমার সঙ্গে দীর্ঘ প্রেমের দিনগুলোতে তিনি করে গেছেন একের পর এক অসাধারণ সব ছবি – 'নিমন্ত্রণ', 'কুহেলী', 'বালিকা বধূ', 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ', 'গণদেবতা', 'দাদার কীর্তি' থেকে 'ভালোবাসা ভালোবাসা', বা সাম্প্রতিক অতীতে 'আলো' আর 'চাঁদের বাড়ি'। তরুণবাবুর কাছে 'ফুলেশ্বরী' তাঁর প্রিয়তম ছবি, আর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সংসার সীমান্তে' অঘোরের চরিত্রে অভিনয়—তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা সম্পদ বলে ব্যক্ত করে গেছেন শিল্পী নিজেই। তরুণবাবুর পরিচালিত অনেক ছবিই রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত, আবার দর্শদেরও মনোরঞ্জনের ক্ষুধা মিটিয়েছিল তাঁর তৈরি ছবিগুলো।

তরুণ মজুমদারকে আমরা যতটুকু জেনেছি বা তাঁর যে সমস্ত অবিস্মরণীয় ছবিগুলো দেখেছি, আমরা শিল্পীর অন্তরতম জায়গায় প্রবেশ করার ক্ষেত্রে সঠিক মূল্যায়ন সে ভাবে করে উঠতে পারিনি। ঠিক যেভাবে, সিনেমা aesthetics কে যার যার নিজের ভাবনায় জারিত করার প্রয়াসী হয়ে আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন পরিচালকের কাজ ছাড়া অন্যান্য অনেকের ক্ষেত্রে একটি কল্পিত সীমারেখা অঙ্কন করে দিই। যে ভাবে আমরা সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক বা মৃণাল সেনের কাজে cinematic identity খুঁজে বেড়াই, সেভাবে, তপন সিংহ, অসিত সেন, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, রাজেন তরফদার এবং তরুণ মজুমদারের মত পরিচালকদের "মধ্যধারার" চলচ্চিত্রকার হিসেব একটু ব্রাত্য করে রাখি। অথচ, তরুণবাবুর মৃত্যুতে সব বাঙালিরা যে এতটাই হৃদয়-হারা হয়েছেন, সেটা কোন জায়গা থেকে? ঠিক কি 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ', 'বালিকা বধূ', 'দাদার কীর্তি 'বা 'ভালোবাসা ভালোবাসা'–র নিখাদ নিটোল বাঙালিদের কিশোর প্রেমের কাহিনী ও নাট্য বিন্যাসের জায়গা থেকে, না কি, 'ঠগীনি' বা 'কুহেলী'–র রহস্যময়তার আবরণ থেকে? না কি, 'পলাতক', 'নিমন্ত্রণ', 'ফুলেশ্বরী'-র গ্রামীণ পটচিত্রের সফল অলঙ্করণ থেকে, না কি, 'সংসার সীমান্তে' বা 'গণ দেবতা'–র কাহিনী বিন্যাসে সাবালটার্ন ও marginalised সমজভুক্ত মানুষের লড়াইয়ের অসাধারণ চিত্রায়ণের মুগ্ধতায়!

দাউ দাউ করে জ্বলছে গ্রামীণ সমাজ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর তন্তুবায় বা কামার শ্রেণীভুক্ত দরিদ্র মানুষের অস্তিত্বের লড়াই, মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চারিত গ্রাম ভূমি, এসব সমস্যার contemporaneity এখনও বর্তমান, এখনও গ্রাম জীবনে সমকালীন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে গ্রামীণ কথ্য ভাষায় তাঁর জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাসটি লিখেছিলেন, ঠিক ততটাই অনমনীয়ভাবে তরুণবাবু তাঁর ছবিটি এত বড় span নিয়ে করার সাহস দেখিয়েছেন। তাঁর মনের মাঝে ছাই চাপা আগুনই যেন অগ্নুৎপাতের মত 'গণদেবতা' ছবিটিতে প্রতিটি নাটকীয় ভাঁজে ছড়িয়ে পড়েছে। ক্যানভাস বড়, অর্থাৎ কালের চিত্ররূপে, বৃহৎ পটভূমিতে, প্রচুর চরিত্রের দ্বান্দ্বিক অস্তিত্বের মধ্যেও আলাদা করে সবাই

identified, নাট্য সঞ্চারণের গভীরতায়, সবদিক দিয়ে সুরচিত হয়েছিল সিনেম্যাটিক এই iconic কাহিনীটি। শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ ক্যামেরা সঞ্চারণে রাত্রিকালীন শটগুলোতে অবাধ গতিময়তা ছবিটিকে একটা বলিষ্ঠ রূপ দিয়েছিল। 'গণদেবতা' ছবির পটভূমি কোনও এক কল্পিত শিবকালী নামক গ্রাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর দিনগুলোতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্যহীনতার প্রেক্ষিতে গ্রামের তন্তুবায়, কামার শ্রেণীর মানুষের শাসন ও শোষকের বিরুদ্ধে লড়াই, যেখানে আমরা দেখি অস্তিত্বের লড়াইয়ে জয়ী হয়ে নতুন জীবনের শুরুর এক নতুন অনুসন্ধান। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে ছবিতে একটা স্বতন্ত্র চরিত্র। মহাজনের কণ্ঠে (ছবিতে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) একটা উক্তি – এ কেমন সালিশিসভা? যারাই নালিশ করছে, তারাই বিচার করছে! ছোট্ট সংলাপের চাবুক-যোগ বুঝিয়ে দিয়ে যায়, গ্রামীণ গণতন্ত্রের স্বাধীনকামী বৈশিষ্ট্যকে।

বাঙালি দর্শক বেড়ে উঠেছে narratives এর মধ্যে দিয়ে। Neo realist ফিল্মের ধারাকে আঁকড়ে ধরে। সেখান থেকে, তরুণ বাবুর ছবি ভীষণ communicative, মানুষ দেখে তৃপ্ত হয়, সু-চেতনা, সু-সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা গভীর জীবনবোধের বার্তা দেয়। তরতরিয়ে গল্প বলা শিল্পসুষমামণ্ডিত বড় একটা কঠিন কাজ, সিনেমায় তো বটেই। যেটাতে সত্যজিৎবাবু ছিলেন একজন master craftsman। তরুণ মজুমদারের ছবি সেই ক্লাসিক্যাল অ্যাপ্রোচকে সঙ্গে করেই ব্যক্ত হয়েছে, ছবির মূল উপপাদ্যটিকে সরসভাবে বজায় রেখেও বিভিন্ন জীবন ধারার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন dramatic psyche কে maintain করে, এমন এক স্বকীয় মেজাজে তাঁর ছবিগুলো বিধৃত হয়েছে, যা একান্তই 'তরুণীয়'। তরুণ মজুমদারের মত চলচ্চিত্রকারেরা শুধু দায়বদ্ধতার তাগিদে সিনেমা করেননি, সেই ছবিগুলোর মধ্যে নানাভাবে উঠে এসেছে নীতি ও নীতিহীনতা, আদর্শ ও আদর্শহীনতা, মূল্যবোধ ও মূল্যবোধহীনতার চিরকালীন দ্বৈতরথ, বারবার নব প্রজন্মের কাছে চরিত্রগুলো ধরা দিয়েছে সঠিক পথের দিশা দেখাতে। সেদিক দিয়ে, তরুণ মজুমদার নিজেই একজন সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান।

অনেক তারকাদের সমাবেশেও তরুণবাবু প্রতিটি ছবির প্রতিটি চরিত্রগুলোকে বিন্যাস করেছিলেন অবলীলাক্রমে। এগুলো অতি দক্ষ পরিচালকেরাই সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। আর যেটা তরুণবাবুর সর্বোৎকৃষ্ট দক্ষতা ছিল, তা হল তাঁর সিনেমাগুলোতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের, folk এবং রাগাশ্রয়ী গানের অসাধারণ উপস্থাপনা এবং প্রতিটি গানের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ রচনা করে সিনেম্যাটিক মুড তৈরি করা, যা এককথায় অনবদ্য। 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' ছবিতে 'সখি ভাবনা কাহারে বলে' গানটি প্রাক-বর্ণনাহীন হঠাৎ-সৃষ্ট গানের সিচুয়েশান অনুযায়ী দুই নারীর নিঃসঙ্গতা ব্যক্ত ক'রে গানের কথায় ব্যবহৃত প্রতিটি ইমেজকে চরিত্রগুলোর অন্তর্নিহিত একাকিত্বের মুডকে মিলিয়ে দিয়ে যায়। 'কুহেলি' ছবিতে 'তুমি রবে নীরবে', 'দাদার কীর্তি' ছবিতে 'চরণ ধরিতে দিও গো আমারে' আর 'বধূ কোন আলো লাগলো চোখে' বা 'চাঁদের বাড়ি' ছবিটিতে চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙ্গেছে' – ইত্যদি অজস্র ব্যবহৃত গানগুলোর সিনেমায়ন মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়-ছোঁয়া অনুভূতির স্বাক্ষর।

সাহিত্যধর্মী ছবি নির্মাণের স্পর্ধা এখন নিম্নগামী। তরুণবাবু সেখানে বাংলা সাহিত্যের দিকপাল লেখকদের কালজয়ী কাহিনীগুলোকে সিনেমায়িত করার সাহস দেখিয়েছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ স্যান্যাল, বিমল কর, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ থেকে মনোজ বসু – বাংলার সেরা সাহিত্য তরুণবাবুর দক্ষতায় চলমান দৃশ্যরূপ পেয়েছিল। তিনি তাঁর ছবিতে এক্সপেরিমেন্ট কম করেছেন, সাহিত্যের অন্তর্লীন উপাখ্যানগুলো, নাটকীয় উপাদানগুলো, গল্পবিন্যাসের গ্র্যাফিক্যাল ধারাবাহিকতা বজায়

রেখে সাবলীলভাবে গল্পটি communicate করে গেছেন সহজ বুননের ন্যারেটিভ স্টাইলে।

তাঁর ছবি বাণিজ্যিকভাবে সফল, কারণ তিনি তাঁর ছবিতে বলা গল্পটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সরসভাবে মুন্সীয়ানার সাথে বিস্তার করতেন, যা দর্শকদের মাধ্যমজাত করত। তাঁর ছবির উপস্থাপনায় অবশ্যই নিজস্বতা ছিল, আমেজ ছিল, প্রেম ও সম্পর্কের বাস্তবিক ভিত্তি ছিল, নাট্য দ্বৈততাগুলোকে পরিশীলিত রুচিবোধে, রিয়্যালিস্ট প্রেক্ষাপটে সযত্নে উপস্থাপিত করতেন – যেখানে তাঁর ছবি শিল্পোত্তীর্ণও হয়ে উঠতো। এখানেই তরুণবাবু স্বতন্ত্র। ব্যতিক্রমী।

প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে প্রবহমানতার শেষ সুতো তিনিই ছিলেন। সিনে ল্যাবরেটরিগুলো খেকে সেলুলয়েডের আবেশ করা গন্ধ এখন আর পাওয়া যায় না, ববিন-স্প্লাইসার-স্পুল-স্পকেট - এসব শব্দ এখন আর্কাইভড, মুভিয়ালা সম্পাদনা মেশিনের ঘরঘর যান্ত্রিক উপস্থিতি আজ অতীত। তবু তার পরেও, বহুদিন ধরে তরুণবাবু নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর সম্পাদনা বিল্ডিং-এর সিঁড়ির তলার অফিসকক্ষে রপ্ত করার প্রয়াসী ছিলেন, 'নিউ মিডিয়া'-র মধ্যে দিয়ে কীভাবে নতুনতর প্রক্রিয়ায় সিনেমার সন্ধানী হওয়া যায়। তাঁর মৃত্যু নিয়ম-সময়ের হাত ধরেই। কিন্তু অনেক গর্ব তিনি আমাদের জন্য রেখে গেলেন। রেখে গেলেন স্বর্ণযুগের বাংলা সিনেমার সেরা কিছু সম্পদ, যা কালজয়ী হয়ে রইল। বিখ্যাত পরিচালক স্যার জেমস আইভরি একবার একটি কথা বলেছিলেন, "Once a film is a classic, always a classic"। বাংলা সিনেমার ক্ল্যাসিক যুগের সেরা ক্ল্যাসিক শিল্পীদলের এক রূপকার শ্রী তরুণ মজুমদারও আজ থেকে এই ক্ল্যাসিক যুগের প্রাক্তনী হয়ে গেলেন।

তাঁর সব রচনা সম্ভার থেকে যাক সেই স্বপ্নের চাঁদের বাড়ির অন্দরমহলে। যখন আমরা নিজেদের শিকড়ের সন্ধানে, অস্তিত্বের প্রয়োজনে পৌঁছব সেই সুনীল বাড়ির দোর দালানে, আবার হয়তো আমরা সে ছবিগুলো দেখে নিজেদের জারিত করার ভাগ্য পাব ফিরে, মনের অন্দরেই সুচারুভাবে অনুরণিত হবে, সেই 'আলো' ছবিতে বৃদ্ধার পুরনো অ্যালবাম দেখে সরলতাময় অশ্রু বিসর্জন, সুদূর পারের থেকে আগত অশ্রুধারার মতন।

তাঁকে যেভাবে পেয়েছিলাম

ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল
সম্পাদক, 'বৈশাখী'

২০০৫ সালে আফ্রিকা সাহিত্য নিয়ে *বৈশাখী*-র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের পর ২০০৬ এর গোড়ায় সিদ্ধান্ত নিলাম এবার একটা চলচ্চিত্র বিষয়ক সংখ্যা করব। কি করা যায়! অতীত কিংবা বতর্মানের কোনো জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রী, না কোন প্রথিতযশা চলচ্চিত্র পরিচালক। এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে একদিন সন্ধ্যায় আমার কাগজের অভিভাবক, উপদেষ্টা, বিশিষ্ট নাট্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বিষ্ণু বসুর কালিন্দী স্টেটের বাড়িতে হাজির হলাম। সেখানে অনেকক্ষণ আলোচনার পর ঠিক হল তরুণ মজুমদারকে নিয়ে একটা সংখ্যা করা হোক। দক্ষ পরিচালক। ওঁর বহু ছবি বাঙালির হৃদয় ছুঁয়ে আছে। 'নিমন্ত্রণ', 'ফুলেশ্বরী', 'বালিকা বধূ', 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ', 'দাদার কীর্তি'-র মত রুচিশীল প্রসন্ন সব ছবি। অন্যদিকে 'গণদেবতা', 'সংসার সীমান্তে'র মতো সমাজ সচেতন সিনেমাও করেছেন। এছাড়া আগে ওঁকে নিয়ে এমন উদ্যোগ কেউ নেননি। আমরা করলে অভিনব ব্যাপার হবে। কিন্তু তরুণবাবু কি রাজি হবেন? প্রশ্ন সেটাই। চেনা-জানা নেই, কোনদিন *বৈশাখী*-র একটা সংখ্যাও ওঁকে উপহার দিইনি। মানুষটা কেমন তাও জানিনা। যদি পাত্তা না দেন। অদ্ভুত এক ভয় আর উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটছে। এরই মধ্যে একদিন 'নন্দন' প্রেক্ষাগৃহের লাইব্রেরীতে গেলাম। ওখানকার লাইব্রেরীয়ান গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে মনের কথা খুলে বলতে, উনি বললেন, "নির্মল ধরকে (ফিল্ম জার্নালিস্ট) ধরো। উনি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। আজ তো উনি আসেননি। তুমি বরং পরশু দিন এসো আমি কথা বলে রাখব।" আশার বাণী শুনে মনটা খুশিতে ভরে উঠল। দিন দুই পরে আবারও গেলাম নন্দন-এ। কিন্তু সেদিনও দেখা হল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ফিরে এলাম।

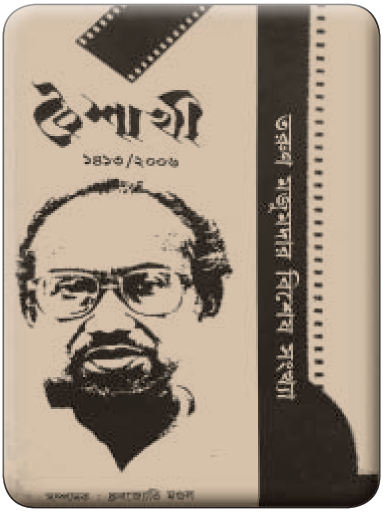

তারপর একদিন গৌতমদার ফোন। বললেন, "আজ বিকেল তিনটের সময় অবশ্যই লাইব্রেরীতে আসবে। নির্মলদার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।" অতঃপর নির্মলদার সঙ্গে দেখা। উনি সেদিনই আমাকে টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ায় নিয়ে গেলেন। ওখানে N.T.-1 স্টুডিওতে তরুণবাবুর বসার ঘর। কিন্তু এমনই পোড়া কপাল যে, তরুণবাবুকে সেদিন পাওয়া গেল না। তবে সিনেমা পাড়ায় নির্মলদার যোগাযোগ দেখে অনুমান করলাম কাজ হয়ে যাবে। আসলে উনি তো শুধু ফিল্ম জার্নালিস্ট নন একসময়ে বি. এফ. জে. এ-র সেক্রেটারিও ছিলেন। ফলে সমস্যা হল না। কেন

একথা বলছি তার কারণ এর দিন তিনেক পর তরুণবাবুর দেখা পেলাম। ওঁর ঘরে বসে মুখোমুখি কথা হল। কয়েকটি পুরনো সংখ্যা দিয়ে পরিচয় সারলাম। উনি মনযোগ সহকারে উল্টেপাল্টে সেগুলি দেখার পর বললেন, “বলুন কী বলতে চান।” গুরুগম্ভীর গলা। কম কথার মানুষ। সব শুনে নির্মলদার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, উনি যে জিনিসগুলো দেবেন সেসব ফেরতের কি হবে। নির্মলদা বললেন, “আপনি দিন, আমি আছি। ধ্রুব ফটোকপি করে ফেরত দেবে।” সেদিন ওই পযর্ন্তই কথাবার্তা হল। এরপর একদিন যেতে উনি তাঁর বিভিন্ন সিনেমার কিছু স্টিল ছবি দিলেন। তার মধ্যে ‘বালিকা বধূ’-র দুটি মিষ্টি ছবি ছিল। লোভ সামলাতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম, ‘বালিকা বধূ’-র চিত্রনাট্যটা কি আপনার কাছে আছে? ছাপার খুব ইচ্ছে ছিল স্যার। তরুণবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিষন্ন দৃষ্টিতে উত্তর দিলেন, “না, ওটা আমার কাছে নেই।” বদলে নিজের হাতে লেখা ‘আলো' ছবির চিত্রনাট্যটি দিলেন ছাপার জন্য। একটি বড় পেটমোটা ফাইলে দুশো পৃষ্ঠার স্ক্রিপ্ট যা ছাপতে হয়েছিল ১৪৩ পৃষ্ঠা। এবং বলেও দিলেন, “কাজ হয়ে গেলে আমি না থাকলেও সুবোধবাবুকে Originalগুলি দিয়ে যাবেন।” ভদ্রলোকের পুরো নাম সুবোধ সেনগুপ্ত। তরুণবাবুর অন্যতম সহকারী।

যাইহোক, তরুণ মজুমদার সংখ্যার কাজ তো শুরু হল। পরিচালক মশাইয়ের কাজের মূল্যায়ন করলেন আর এক বর্ষীয়ান চলচ্চিত্র পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় যিনি স্টুডিও পাড়ায় ঢুলুদা নামে পরিচিত ছিলেন। এই পরিচালককে নিয়ে আমরা ২০০২ সালে সংখ্যা করেছিলাম। যোগাযোগ তো ছিলই তাই অসুবিধা হয়নি। এছাড়া লিখলেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, যশোধরা রায়চৌধুরী, নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শচীন দাশ, সৌমিত্র দস্তিদার, প্রণবেশ মাইতি প্রমুখ। স্মৃতিচারণ করলেন, দুলাল দত্ত, সৌমেন্দু রায়, সংগীত শিল্পী শিবাজী চট্টোপাধ্যায়। অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, তাপস পাল প্রমুখ। আর তরুণবাবুর সাক্ষাৎকার নিলেন নির্মল ধর। বর্ধমানের এক গ্রামে যেখানে তনুবাবু বেশিরভাগ সময় নিরিবিলিতে কাটাতেন, কাজ করতেন সেখানে গিয়ে। সে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। সেখানে উঠে এসেছে বাংলাদেশের ছোট্ট শহর বগুড়ায় কাটানো তাঁর শৈশবের দিনলিপি। যৌবনে কলকাতায় পড়াশোনার শেষে কর্মজীবনে প্রবেশ। কানন দেবীর শ্রীমতী পিকচার্সে শিক্ষানবিশির কাল এবং সেখানে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে তিলে তিলে নিজেকে গড়ে তোলা। একই সঙ্গে তনুবাবুকে নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা এবং ওঁর নিজের লেখা, জাতীয় গ্রন্থাগারে বসে খুঁজে পেতে বেশ কয়েক মাস লেগে গেল। তরুণবাবু পরিচালক হলে কী হবে লেখার হাত দারুণ। গল্প লেখকও হতে পারতেন। আর হাতের লেখা মুক্তোর মত। কাজ করতে গিয়ে অনেকের সঙ্গে বন্ধু হিসেবে পাশে পেলাম *আজকাল* পত্রিকার গ্রন্থাগারিক দেবাশিস মুখোপাধ্যায়কে। শিল্পী দেবাশিস রায় পত্রিকার প্রচ্ছদ এঁকে দিলেন। সে এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। দিন নেই রাত নেই। কাজ করেই চলেছি। অবশেষে *বৈশাখী*-র তরুণ মজুমদার সংখ্যা প্রকাশ পেল ২০০৬-এর নভেম্বরে ঠিক কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সময়। তখন নন্দন-এর ডিরেক্টর তরুণবাবু। চলচ্চিত্র উৎসবে মূলত ফিল্ম সোসাইটিগুলি সিনেমা বিষয়ক বই, পত্রপত্রিকা বিক্রির জন্য স্টল দেয়। সেইসব স্টলে বই রাখা ছাড়াও রবীন্দ্রসদন নন্দন চত্তরে কিছু আকর্ষণীয় পোস্টার ফেস্টুন লাগিয়েছিলাম। এর ফলে প্রচার হয়েছিল ব্যাপক। বিক্রিবাট্টাও তুঙ্গে উঠেছিল। ওখানকার স্টলগুলি যেমন বারবার ফোন করে বই চেয়ে পাঠাচ্ছিল তেমন উৎসব প্রাঙ্গণ থেকেই খবর পাচ্ছিলাম রেল স্টেশনের হুইলারে পর্যন্ত পত্রিকা পৌঁছে গেছে।

এদিকে তরুণবাবুকে ফোন করে পত্রিকা প্রকাশের কথা জানালাম। শত ব্যস্ততার মধ্যেও উনি ডেকে নিলেন। ওই ‘নন্দন’ পেক্ষাগৃহেই ওঁর হাতে সংখ্যা তুলে দেবার পর উনি আশীর্বাদ করেছিলেন।

কথায় কথায় বলেছিলেন, “আপনি তো ভালোই কাগজ করেন। আপনার দেওয়া সংখ্যাগুলি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আমি সব পড়ে ফেলেছি।” এরপর থেকে তরুণবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক আরো গভীর হয়। উনি আমাকে ফোন করেন, আমি ওঁকে। পরবর্তীকালে পত্রিকার ব্যাপারে অনেক পরামর্শও নিয়েছি ওঁর কাছে। তরুণ মজুমদার সংখ্যার পর *বৈশাখী*-র একাধিক সিনেমা সংখ্যার প্রকাশ ঘটেছে। অজয় কর, রাজেন তরফদার, শতবর্ষে কানন দেবী, মহানায়ক উত্তমকুমার, ও শতবর্ষে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংখ্যা। প্রত্যেকটি সংখ্যাতেই ওঁর লেখা পেয়েছি। আমার আবদার উনি রেখেছেন। এই কিছুদিন আগেও ওঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বলেছিলাম, আপনাকে নিয়ে আবারও একটি সংখ্যা করতে চাই। একটু অন্যভাবে। আপনি সাহায্য করুন। বলেছিলেন, নিশ্চয় করব। শরীর খারাপ। পরে একদিন ফোন করুন। তার দিন পনেরো পরেও যোগাযোগ করেছিলাম কেমন আছেন জানতে। উত্তর ছিল একই। এর পরের ঘটনা তো সবার জানা। তরুণবাবু আপনাকে প্রণাম।

On 23 June 2022, India Society of Engineers and Poets Foundation jointly organised the 169th Birth Anniversary programme of a now-a-days forgotten legendary Bengali Architect, Engineer, Industrialist cum Businessman, Sir Rajendra Nath Mookerjee in a befitting grandiose manner at the Rotary Sadan Auditorium, Kolkata. Dr. Satyabrata Chakrabarti, General Secretary, The Asiatic Society, is delivering his address in the programme.

একটি অপ্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরান্তর

দেবাশিস রায়
রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী

গান কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে প্রচারিত হওয়াই আমাদের দেশে চিরাচরিত রীতি। কণ্ঠ থেকে উৎসারিত গানের সজীব গীতরূপ রক্ষণে এই পন্থাই প্রযোজ্য। কিন্তু যেহেতু রচয়িতা সর্বদেশে ও সর্বকালে বর্তমান থাকেন না এবং সদ্‌গুরু শিষ্য পরম্পরায় যোগাযোগ সবসময় সুলভ নয় এবং উৎস সৃষ্টির কাল থেকে ক্রমশ সময়ের ব্যবধানে স্মৃতি-বিস্মৃতির সমস্যাও উদ্ভূত হওয়া সম্ভব, সেজন্য গানের সুর-রক্ষণের অন্যতম উপায় স্বরলিপি (ছন্দোবদ্ধ)। যে-লিপিতে গানের কথা ও সুর ছন্দোবদ্ধভাবে গ্রথিত হয় তাকেই আমরা স্বরলিপি বলি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র গানের মাত্র দু-একটি স্বরলিপি করে গেছেন। এছাড়া বাকি সবই করেছেন অন্যান্য স্বরলিপিকারেরা। রবীন্দ্রগানে স্বরলিপি সংরক্ষণে যাঁর নাম সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য, তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্তমানে বিশ্বভারতী থেকে আকারমাত্রিক পদ্ধতিতেই রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি প্রকাশিত। এই আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির উদ্ভাবকও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গানের স্বরলিপি বিশ্বভারতীর ৬৬টি স্বরবিতান গ্রন্থে প্রকাশিত। 'বাজে করুণ সুরে হায় দূরে' প্রেম পর্যায়ের ও প্রেম-বৈচিত্র উপপর্যায়ের গানটির রচনাকাল/প্রকাশকাল ২৬ ফাল্গুন ১৩৩৭, ১০ মার্চ ১৯৩১। কবির ৬৯ বছর বয়সের রচনা। উৎস গ্রন্থ : *নবীন, বনবাণী, গীতবিতান* (১ম সং) ৩য় খণ্ড শ্রাবণ ১৩৩৯, *গীতবিতান* (২য় সং) ২য় খণ্ড ভাদ্র ১৩৪৬। *নবীন* (ফাল্গুন ১৩৩৭) গীতিআলেখ্যের দ্বিতীয় পর্বের দশম গান। নবীন গীতিআলেখ্যটি *বসন্ত* নামে চৈত্র ১৩৩৭ সালে 'নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে' মঞ্চস্থ হয়েছিল। ২০ ফাল্গুন ১৩৩৭ শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব উপলক্ষে এটি অভিনীত হয়। সাবিত্রী গোবিন্দর কণ্ঠে দক্ষিণ ভারতীয় মূলগান : 'নিতু চরণমূলে', শুনে সেই সুরের অনুসরণে কবি এই গানটি রচনা করেন। ২৯ বৈশাখ ১৩৪১ কলম্বোতে *শাপমোচন* অভিনয়ের সময়ও কবি এই গানটি ব্যবহার করেন। এই গানটির দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত স্বরলিপি *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা* পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯) এই স্বরলিপিটি *স্বরবিতান* পঞ্চম খণ্ডে সংকলিত হয়। এই গানটির একটি সুরান্তর আমরা পাই কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গীত ইউটিউবের 'সা রে গা মা' প্রকাশিত গানে। এও লক্ষ্য করা যায় যে ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের প্রথম সারির প্রায় সব রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীই কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গীত সুরের অনুসরণে গানটি রেকর্ড করেছেন। এই সুরটিই বর্তমানে বহুল প্রচারিত। এই সুরটির কোনো স্বরলিপি এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। সেইজন্যে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুক্তছন্দে গাওয়া গীতরূপ অনুসরণ করেই স্বরলিপি প্রস্তুত করে এই সংখ্যায় সংকলিত হল।

বাজে করুণ সুরে হায় দূরে
তব চরণতলচুম্বিত পন্থবীণা।।
এ মম পান্থচিত চঞ্চল
জানি না কী উদ্দেশে।।
যূথীগন্ধ অশান্ত সমীরে
ধায় উতলা উচ্ছ্বাসে,
তেমনি চিত্ত উদাসী রে
নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে।।

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : দেবাশিস রায়

II না -র্সাঃ -নঃ (ন)দা (-দ)পা (-প)হ্মা পা দা না না র্সা -া -া -া -া
বা ০ ০ জে ০ ০ ক রু ণ সু রে ০ ০ ০ ০

পদা -নসা (-র্স)র্রা (-র্র)র্জ্ঞা (-র্র)র্জ্ঞা-র্জ্ঞর্মা (-র্ম)র্রা -া -া (-র্র)র্জ্ঞা র্সা -র্জ্ঞা -া র্রর্সা র্সা -া (-র্স)র্রা
হা০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ য়্ দূ ০ ০ ০০ রে ০ ০

না -র্সাঃ -নঃ (ন)দা (-দ)পা (-প)হ্মা -া -া পা দা না না -া র্সা -া -া -া -া
বা ০ ০ জে ০ ০ ০ ০ ক রু ণ সু ০ রে ০ ০ ০ ০

(র্স)র্রা র্রা -া -া র্রা (-র্র)র্জ্ঞা (র্জ্ঞ)র্রা র্রা (র্স)র্সা -না র্সর্রর্সা -নর্সা নর্সা (-র্স)পা পা পা
ত ব ০ ০ চ ০ র ণ ত ০ ল০০ ০০ চু০ ম্ বি ত

মপমা-মপমা (প)রা জ্ঞা রা সা মপা-নর্সা (-র্স)র্রা (-র্র)র্জ্ঞা (-র্র)র্জ্ঞা (-র্র)র্জ্ঞা-র্জ্ঞা-র্মা-র্রা-া -া র্জ্ঞা
প০০ ০০০ ন্ থ বী ণা হা০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

র্সা -র্জ্ঞা -া -র্রর্সা র্সা -া -া -র্রা না র্সাঃ -নঃ (ন)দা (-দ)পা (-প)হ্মা -া -া
দূ ০ ০ ০০ রে ০ ০ ০ বা ০ ০ জে ০ ০ ০ ০

পা দা না না -া র্সা -া -া -া -া র্রা র্জ্ঞা র্রা -া -া-া -া র্রা -া -া (র্র)র্জ্ঞা র্জ্ঞর্রা র্রর্সা
ক রু ণ সু ০ রে ০ ০ ০ ০ এ ম ম ০ ০ ০ ০ পা ০ ন্ থ চি০ ত০

(ন)র্সা (-ন)র্সা (-ন)র্সা (-ন)র্সা-পা (প)নানা-র্সা-া-া-া-া নর্সা-র্রর্জ্ঞা (-র্র)র্জ্ঞা (-র্র)র্জ্ঞা (-র্র)র্জ্ঞা-র্জ্ঞর্মা-র্রা -া -া(র্জ্ঞা)
চ ০ ০ ০ ন্ চ ল ০ ০ ০ ০ ০ হা০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০০
-র্জ্ঞর্রা-র্সনা-পনা-র্সর্রা -র্সনা-র্সা
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ য়্

নর্সা-র্রর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা (-র্জ্ঞ)র্রা র্রা -া -া -া -া র্রা -া -র্পা র্মর্পা র্পা -র্রা র্রা -র্সা
হা০ ০য়্ এ ম ০ ম ০ ০ ০ ০ পা ০ ন্ থ০ চি ০ ত ০

ন্র্সা -ন্র্সা -ন্র্সা -ন্র্সা -র্সপা পনা নর্সা -া -া -া -া　　সা -র্জ্জা র্রা -া র্রর্সা -া
চ ০ ০ ০ ন্ চ ল০ ০ ০ ০ ০　　জা ০ নি ০ না০ ০

নর্সাঃ -র্সনঃ নর্সাঃ পঃ মপা -নর্সা -র্রজ্জা -া র্রজ্জা র্রজ্জা -জ্জর্মা -া -া র্রা -া -র্জ্জা
কি০ ০ উ০ দ্ দে০ ০০ ০০ ০ শে ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

র্সা -র্জ্জা -া -র্রর্সা র্সা -া -র্সর্রা　　না -র্সাঃ -নঃ নদা -দপা -পহ্মা -া -া
দূ ০ ০ ০০ রে ০ ০　　বা ০ ০ জে ০ ০ ০ ০

পা দা না না -া র্সা -া -া -া -া　　পা দা পা -হ্মপা পা
ক রু ণ সু ০ রে ০ ০ ০ ০　　যূ থী গ ন্ ধ

পা হ্মপদা -হ্মপা -জ্ঞা জ্ঞা　রা -া -জ্ঞা জ্ঞরা -া রসা　রা -রা -া জ্ঞা জ্ঞরা রসা
অ শা০০ ০০ ন্ ত　স ০ ০ মী ০ রে　ধা ০ য়্ উ ত লা

দপা -দপা -দপা -জ্ঞা হ্মা পা -া -পহ্মা -জ্ঞমা -পদা -পহ্মা -পা -া -া
উ০ ০০ ০০ চ্ ছা সে ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০

র্রা র্জ্জা র্রা -া -া -া -া　র্রা -া র্জ্জা -া র্জ্জর্রা -র্রর্সা নর্সা　-নর্সা -নর্সা -পা -া না নর্সা -া -া -া -া
তে ম নি ০ ০ ০ ০　চি ত্ ত ০ উ০ দা০ সী　০ ০ ০ ০ ০ রে ০ ০ ০ ০

নর্সা -র্রজ্জা -া -া -া -র্জ্জর্রা -র্সনা র্সর্রা -া -া -া -া -র্জ্জর্রা -র্সনা -পনা -র্সর্রা -র্সনা র্সা -া -া -া -া
হা০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০য়্

নর্সা -র্রজ্জা র্জ্জা র্জ্জা র্জ্জর্রা -া -া -া -া　র্রা -া র্পা র্মর্পা র্পা -র্রা র্রা -র্সা নর্সা নর্সা -পা -না
হা০ ০য়্ তে ম নি ০ ০ ০ ০　চি ০ ত্ ত০ উ ০ দা ০ সী ০ ০ ০

না -র্সা -া -া -া -া　র্সা নর্সা র্রজ্জা -া -া র্রা -া র্রর্সা -া -া　র্সা -া নর্সা -র্রজ্জা -া র্জ্জর্রা -া র্রর্সা
রে ০ ০ ০ ০ ০　নি দা০ ০০ ০ ০ রু ০ ণ ০ ০　বি চ্ ছে০ ০০ ০ দে০ ০ র

র্সা -া নর্সা -র্রজ্জা -া র্রজ্জা -র্রজ্জা -জ্জর্মা -া -র্মরা -া -া -া -া　র্সা -র্জ্জা -া -র্রর্সা র্সা -া -া র্রা
নি ০ শী০ ০০ ০ থে ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০　দূ ০ ০ ০০ রে ০ ০ ০

না -র্সাঃ -নঃ নদা -দপা -পহ্মা -া -া　পা দা না না র্সা -া -া -া -া II II
বা ০ ০ জে ০ ০ ০ ০　ক রু ণ সু রে ০ ০ ০ ০

আন্দামান সেলুলার জেলের প্রথম পর্ব (১৯০৯-১৯২১) – অত্যাচার ও প্রতিরোধের কাহিনী

অমিত রায়
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়

প্রথম গোলাওয়ালার দল

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯০৯। বন্দিপরিবাহী জাহাজ, 'মহারাজা'য় প্রথম দফায় মানিকতলা বা আলিপুর বোমা মামলায় দণ্ডিত সাতজন – বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায়, বিভূতিভূষণ সরকার এবং অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য – প্রথম রাজবন্দির দল কলকাতা থেকে এসে পৌছালেন আন্দামানে। তাঁদের নিয়ে যাওয়া হল নবনির্মিত সেলুলার জেলে। ১৮৯০-এর লায়াল এবং লেথব্রিজ কমিটির সুপারিশক্রমে আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপের বন্দিদের দিয়েই এই সেলুলার জেল গড়ে তোলা হয়েছিল ১৮৯৬–১৯০৬ সময়কালের মধ্যে।

সেলুলার জেলের ফটক দিয়ে প্রবেশ করার পর সবার ডাণ্ডাবেড়ি কাটা হল। এরপর প্রথম মোলাকাত জেলার ব্যারী সাহেবের সঙ্গে। কয়েদিদের কাছে ডেভিড ব্যারী যমস্বরূপ। বগলে লাঠি নিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন। সম্মুখস্থ রাজবন্দিদের সারির দিকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে তাঁর প্রথম গর্জন বেরোল – "So here you are, at last! Well, you see that block yonder. It is there that we tame lions. You will meet your friends there, but mind you don't talk."

ব্যারী সাহেবের সঙ্গে মোলাকাত হবার পর কয়েদিদের সবার মাথা ন্যাড়া করা হল এবং ৬ আঙ্গুল চওড়া, দেড় হাত লম্বা একটা লেংটি সবাইকে

সেলুলার জেল, তখন। (নেটচিত্র)

পরতে দেওয়া হল। এরপর সবাইকে আলাদা আলাদা করে রাখা হল পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন সেলে।

যমরাজার কারাগারে

প্রতিদিন সকালে সেলুলার জেলে কয়েদিদের যে খাবার দেওয়া হত তা হল এক ডাব্বু পরিমাণ কাঞ্জি বা গঞ্জি (ভাতের মাড়) – এতে না আছে লবণের লেশমাত্র, না আছে কোনো স্বাদ। এখানে রান্নায় যে তেল দেওয়া হত তা যে সব সময় নারকেল বা সর্ষের তেলই হত তা নয়, কখনো সখনো কেরোসিন তেলও রান্নায় ব্যবহৃত হত। কচুর গোড়া, ডাঁটা ও পাতা, চুবড়ি আলু, খোসাসমেত কাঁচকলা ও পুঁই শাক, ঘাস, পাতা, শিকড়বাকড়, গাছের ডালপালা, তার সঙ্গে সমুদ্রের বালি, ইঁদুরনাদি কোনো কিছুই বাদ যেত না। এখানে কয়েদিদের চেহারা ও ওজন যাই হোক না কেন, সবার জন্য খাদ্যের পরিমাপ একই।

সেলুলার জেলে রাজবন্দিদের জীবন ছিল কঠিন। প্রতিমুহূর্তে তাঁদের শিরদাঁড়া নমনীয় করার প্রচেষ্টা জারি ছিল। এঁদের বেশিরভাগই শিক্ষিত ভদ্রঘরের সন্তান। প্রাক্-সেলুলার দশায় এঁদের সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমের কোনো যোগ ছিল না। কিন্তু এখানে সর্বাধিক পরিশ্রমের কাজে তাঁদের যুক্ত করা হত। কলুতে যুক্ত করে শুকনো নারকেল ও সর্ষে পেষাই করে তেল বের করার কাজে ঘানিতে বলদের বদলে যুক্ত করা হত তাঁদের, বেঁধে দেওয়া হত তেল নিষ্কাশনের লক্ষ্যমাত্রা, তা পূরণ না করতে পারলে তাদের কপালে জুটত অবর্ণনীয় অত্যাচার। তা ছাড়া ছিল নারকেল ছোবড়া পেটাই করে তার থেকে তার বের করে দড়ি পাকানোর কাজ, যা ছিল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। এর পাশাপাশি আরও নানাধরনের কাজে নিযুক্ত করা হত তাঁদের।

এখানে তেল নিষ্কাষণের যে ঘানি, তা ঘোরানোর কাজে লাগে প্রচণ্ড শক্তি। এখানে যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিরা এসেছিলেন তাঁদের বয়স এবং শারীরিক ক্ষমতাকে মান্যতা না দিয়ে জুতে দেওয়া হত এই ঘানিতে। কোটা পূরণ করতেই হবে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে, কোনমতে শৌচকর্ম সেরে, কঞ্জি গিলে শুরু করে দিতে হত কাজ। সকাল দশটার ঘন্টা পড়লে খাবার সময়। কোনমতে নাকে মুখে কিছু গুঁজে দিনের কোটা শেষ করতে কাজ চালিয়ে যেতেন বন্দিরা। বিকেল পাঁচটায় সারাদিনের পরিশ্রমে শরীর যখন আর চলছে না, তখনও রেহাই মিলত না। কাজ চলত রাত আটটা-ন'টা পর্যন্ত।

রাজবন্দিদের অনেকেই প্রথম প্রথম কাজের কোটা শেষ করতে পারতেন না। প্রথমবারে তাঁর জন্য শাস্তি বরাদ্দ ছিল একসপ্তাহের হাতকড়ি। দ্বিতীয় বার এরকম ঘটলে একসপ্তাহ হাতকড়ির সঙ্গে যুক্ত হত অর্ধেক পরিমাণ খাবার। এরপরেও যদি তাঁর কাছ থেকে বরাদ্দমতো কাজ না পাওয়া যেত তাহলে একমাসের জন্য হাতকড়ি ও কম পরিমাণ খাবারের সঙ্গে যুক্ত হত দশ দিনের ক্রশ-বার – যেক্ষেত্রে অপরাধীকে দুই পা ফাঁক করিয়ে বেড়ি বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হত দীর্ঘসময়ের জন্য। তাতেও যদি কাজ না হত তাহলে এই শাস্তি ছয় মাস পর্যন্ত প্রলম্বিত হত, আর তার সঙ্গে যুক্ত হত সলিটারি কনফাইনমেন্ট বা নিভৃত কারাবাস।

সেলুলারে প্রথম প্রতিরোধ

নন্দগোপাল চোপরা পাঞ্জাবি ক্ষত্রিয়। দীর্ঘকায় সুপুরষ। এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *স্বরাজ্য* পত্রিকাতে রাজদ্রোহী তিনটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখার কারণে প্রতিটি নিবন্ধের জন্য দশ বছর করে তাঁর মোট ত্রিশ বছরের দ্বীপান্তরের সাজা হয়। তাঁকে যেদিন ঘানিতে যুক্ত করা হল, তিনি এক অভিনব কাণ্ড ঘটালেন। নন্দগোপাল প্রথমেই বললেন, "এত জোরে ঘানি ঘোরানো আমার পোষায় না।" ঘানি সাধ্যমত আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগল।

এরপর সবাই যখন কোনোমতে দুপুরের খাবার গলাধঃকরণ করে কাজ শেষ করার জন্য ছুটছে তখন নন্দগোপাল সবেমাত্র তিন থেকে চার গ্রাস চিবিয়েছেন। ওয়ার্ডার এবং পেটি অফিসার তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবার জন্য তাঁর ওপর হুকুম জারি করল ও নন্দগোপালকে গালাগালি করতে লাগল।

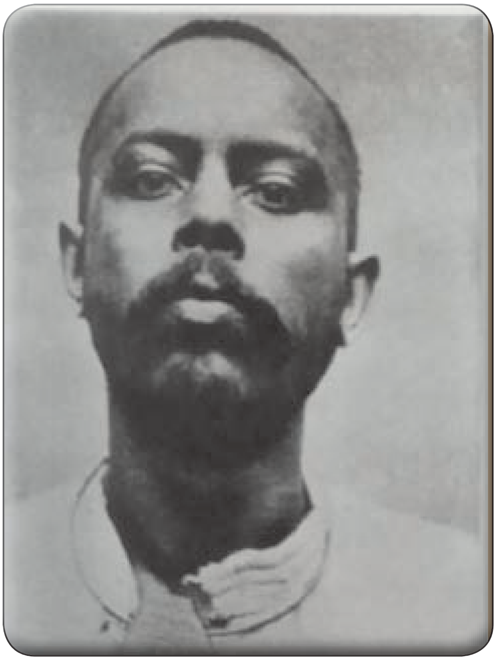

নন্দগোপাল চোপড়া

নন্দগোপাল পাত্তা না দিয়ে মুখের মধ্যেকার গ্রাস চিবিয়ে যেতে লাগলেন। জেলার ব্যারী সাহেবের কাছে রিপোর্ট গেল। ব্যারী সাহেব এসে খুব খানিকটা হম্বি-তম্বি করে নন্দগোপালকে বুঝিয়ে দিলেন যে কাজ যদি সে যথাসময়ে শেষ করতে না পারে তাহলে বেত্রাঘাত অনিবার্য। ব্যারী সাহেব তাঁকে ভয় দেখালেন যে এখানে আইন ভাঙার ফল হবে মারাত্মক। তখন নন্দগোপাল ব্যারী সাহেবকে কারাগার আইন সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, সরকার বাহাদুর যখন দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত আহার ও বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তখন তিনি তো আর সেই আইন ভাঙতে পারেন না, তাছাড়া জেলার সাহেবেরও উচিত আইন না ভাঙা। এই কথা শুনে তো ব্যারী সাহেবের চক্ষু চড়কগাছ। তিনি নন্দগোপালকে ভয় দেখালেন যে দিনের শেষে কাজের কোটা শেষ না হলে তার ফল হবে সাংঘাতিক। এরপর তিনি চটপট সেখান থেকে সরে পড়লেন। সেলুলার জেলে এই প্রথম ব্যারী সাহেব অনুভব করলেন যে তাঁর কর্তৃত্বে ক্ষয় ধরেছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে খাওয়া শেষ হলে নন্দগোপাল নিজের কুঠুরিতে গিয়ে একটা কম্বল নিয়ে মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন।ওয়ার্ডার ও জমাদারেরা নন্দগোপালের সেলে গিয়ে দেখল যে নন্দগোপাল রীতিমতো ঘুমোচ্ছেন, নাক ডাকছে। অজস্র গালাগালিতেও তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত হল না। অন্যান্য বন্দিরা জমাদারদের এই হেনস্থা দেখে হাসাহাসি করতে লাগলেন। কিন্তু জমাদারের দল নন্দগোপালকে ছুঁতে সাহস পেল না। তারা মাথা নিচু করে ফিরে গেল। সেলুলার জেলে এককভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেন এই নন্দগোপালই। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, Passive resistance-এ তিনি মহাত্মা গান্ধীরও গুরু।

কর্তৃপক্ষ মহলে একটা হুলস্থুল পড়ে গেল। তর্জন গর্জন অনেক হল। কিন্তু নন্দগোপাল নির্বিকার পরমপুরুষের মতো নিস্পন্দ এবং সদা স্মিতবদন। নন্দগোপালের কাছ থেকে তিরিশ পাউন্ড তেল বের করার কোনো আশা নেই দেখে সুপারিন্টেন্ডেন্ট মারে সাহেব তাঁকে পায়ে বেড়ি দিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কুঠুরিতে বন্ধ রাখার আদেশ দিলেন আর খাবারের বরাদ্দ অর্ধেক করে দিলেন। নন্দগোপালের এই আচরণ জেলের নিয়মানুবর্তিতাকে এই প্রথম চ্যালেঞ্জ জানাল।

অল্পদিন পরেই আবার তাঁকে ঘানিতে তেল পিষতে দেওয়াতে তিনি সে কাজ করতে অস্বীকার করলেন। তিনি সোজাসুজি বললেন যে তিনি কলুর বলদ নন, তিনি একজন মানুষ। এটা তো রীতিমতো বিদ্রোহ! ফল – বেড়ি ও কুঠুরি বন্ধ। হুকুম হল, সবাইকে আবার তিন দিনের জন্য জেলে ঘানি ঘোরাতে হবে। অনেকেই এবার ঘানিতে কাজ করতে অস্বীকার করলেন। সেলুলার জেলে সর্বপ্রথম ধর্মঘট (১৯১১) শুরু হল।

চারদিন ধরে ধর্মঘটিদের খাবার জন্য দুবেলা শুধুমাত্র 'কঞ্জি'র বরাদ্দ এবং হাতকড়ি,

দাঁড়াকড়ি, ডাণ্ডাবেড়ির টানা ভয়ানক শাস্তিতে এঁদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়লেও কেউই মাথা নত করলেন না। কিছুতেই এঁদের দমন করতে না পেরে অবশেষে জেল কর্তৃপক্ষকে নতি স্বীকার করতে হল। রাজবন্দিদের মধ্যে কয়েকজনকে জেলের ভেতরে ভারী ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ থেকে মুক্তি দিয়ে করোনেশন উৎসবের সময় জেলের বাইরে সেটেলমেন্টে কাজ করতে পাঠানো হল।

আবারও ধর্মঘট, দাবিপূরণ ও কিছু রাজবন্দির মূল ভূখণ্ডে প্রত্যাবর্তন

সন ১৯১২। ইতিমধ্যে জেলের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ইন্দুভূষণ রায় আত্মহত্যা করেছেন (২৮ এপ্রিল, ১৯১২), উল্লাসকর দত্ত উন্মাদ হয়ে গেছেন (জুন, ১৯১২)। অন্যান্যরা এই তিন বছরের অভিজ্ঞতায় বেশ বুঝতে পারলেন, যে জেলে সাজা খাটা শেষ যদিও বা হয় প্রাণ নিয়ে দেশে ফেরা আর হবে না, হয় কেউ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে, নয়তো কেউ পাগল হয়ে মরবে। এই সময় সকলেই স্থির করলেন যে আর নয়, প্রতিবাদ আবারও করতে হবে ধর্মঘটকে হাতিয়ার করে। প্রায় সকলেই স্থির করলেন যে যতদিন তাঁদের জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থা না হয়, ততদিন তাঁরা কোনো ধরনের কাজ করবেন না।

শুরু হল দ্বিতীয় ধর্মঘট। এই ধর্মঘটের মূল দাবি ছিল – ভালো খাওয়া পরা, পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি এবং পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার সুবিধা।

এই ধর্মঘট ভাঙার জন্য এবার জেল কর্তৃপক্ষও তাদের তূণ থেকে চোখা চোখা বাণ বের করে ধর্মঘটিদের ওপর প্রয়োগ করা শুরু করল। তাঁদের হাতকড়ি পরানো হল ও শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হল। তাছাড়া দাঁড়া হতকড়া ও ডাণ্ডাবেড়ি বা ক্রশ-ফেটারে আবদ্ধ করে শাস্তির ব্যবস্থা হল। এতে তাঁদের দমানো তো গেলই না বরং তাঁরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। এর আগে যদিও বা কথাবার্তা আস্তে আস্তে হত, এবার চিৎকার করে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলা শুরু হল। হাতকড়িতে ঝুলিয়ে রাখলেও মুখ তো আর বন্ধ করা যায় না!

কর্তৃপক্ষের যেন সাপের ছুঁচো গেলা অবস্থা হল। সুনাম বা মর্যাদার খাতিরে ধর্মঘটিদের আবদার শোনাও চলে না, আর এদিকে ধর্মঘটও ভাঙে না। এরপর সুপারিন্টেন্ডেন্টের পরামর্শে চিফ কমিশনার কয়েকজনকে সহজ কাজ দিয়ে জেলের বাইরে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রায় দশ বারো জনকে নারকেল গাছের পাহারাওয়ালা করে বাইরে পাঠানো হল।

অনেককে বাইরে কাজে পাঠানো হলেও হোতিলাল ভার্মা, নন্দগোপাল, ননীগোপাল এবং বামন যোশীকে ছাড়া হল না। ফলে জেলখানায় ধর্মঘট চলতে থাকল। জেলের ভেতরে আগে থেকেই সবথেকে বেশি অত্যাচার হয়েছিল ননীগোপাল মুখার্জীর ওপর। চুঁচুড়ার সতেরো বছর বয়সি এই তরুণটি ডালহৌসি স্কোয়ার বোমা মামলায় ১৪ বছরের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে সেলুলারে এসেছিলেন (১৯১১ সালে ২ মার্চ গোয়েন্দা অফিসার ডেনহ্যামকে হত্যার জন্য ভুলক্রমে অন্য এক সাহেবের গাড়িতে বোমা ছুঁড়ে পালাবার সময়ে ধরা পড়েন)। ননীগোপাল নাবালক, আইনবিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে তেলের কলুতে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর অপরাধ তিনি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে প্রথম ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁকে দাঁড়া হাতকড়িতে সারাদিন ঝুলিয়ে রাখা হত। তাঁর ওপর অত্যাচার যত বাড়তে থাকল ননীগোপালের প্রতিবাদী সত্ত্বা তত বিকশিত হতে থাকল। জেদি ননীগোপালকে দিয়ে কোনো কাজ তো করানো গেলই না, উপরন্তু তিনি তাঁর নিজের কাপড়জামা কাচা-ধোয়ার কাজটিও বন্ধ করে দিলেন। তাঁকে তখন জোর করে চটের বস্তার কাপড় পরানো হল। তাও তিনি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এরপর তিনি সমস্ত ধরনের জামাকাপড় পরা ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে থাকতে শুরু

করলেন। তখন জোর করে তাঁকে মাটির সঙ্গে চেপে ধরে তাঁর শরীরে চটের বস্তা সেলাই করে দেওয়া হল। কিন্তু রাত্রেই তিনি তা ছিঁড়ে ফেললেন। তাঁর তখন একটাই কথা – "Naked we came out of our mother's womb and naked shall we return" – 'মায়ের পেট থেকে নগ্ন এসেছি, নগ্নই ফিরে যাব'। একথা বলতে বলতে চটের কাপড় গা থেকে ফেলে দিয়ে সারাদিন উলঙ্গ হয়ে বসে থাকেন। গলার টিকিট ভেঙে ফেলে দেন, চিফ কমিশনার কাছে এসে দাঁড়ালে উঠেও দাঁড়ান না, সেলামও করেন না। কী চাও জিজ্ঞাসা করলে বলেন – "কিছুই চাই না"।

এরপর ননীগোপালকে ভারী শিকল দিয়ে হাত-পা বেঁধে রাখা হল। সেই রাত্রেই তিনি নিজেকে শিকল মুক্ত করে ফেললেন। এই কাজের জন্য শত অত্যাচারেও তিনি কোনো জবাবদিহি করলেন না। এরপর তাঁর নির্জন কারাবাসের আদেশ হল। সেখানে গিয়েও তাঁর আচরণের কোনো পরিবর্তন হল না। তিনি স্নানের জন্যও সেল থেকে বেরোতে অস্বীকার করলে, তাঁকে কয়েকজন মিলে জোর করে কাঁধে তুলে, চৌবাচ্চায় ফেলে নারকেল ছোবড়া দিয়ে এমনভাবে গা ঘষে দিল যার ফলে তাঁর শরীর থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। পাঠান জমাদার তাঁকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করল তবু ননীগোপালের লোহার মতো শিরদাঁড়াকে এতটুকু নমনীয় করা গেল না। ননীগোপাল সেলে ফিরে এসে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থাতেই রইলেন। তাঁর দুটি কম্বলের একটা কেড়ে নেওয়া হল। তিনি আর একটি কম্বলও ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায় সেলের ভেতরে খালি ঠাণ্ডা মেঝেতে পড়ে রইলেন। ব্যারী সাহেব তাঁকে বেত মারার ভয় দেখালেন। কিন্তু কোনো কিছুতেই ননীগোপালকে তাঁর সঙ্কল্প থেকে নাড়ানো গেল না। তাঁর একটাই দাবি তাঁকে রাজবন্দির সম্মান দিয়ে সব ধরনের কাজ ও অপমান থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।

দিনের পর দিন কেটে গেল, ননীগোপাল কঙ্কালের মতো শীর্ণ হয়ে পড়লেন কিন্তু নিজের গোঁ ছাড়লেন না। যখন তিনি দেড় মাসের বেশি অনশনক্লিষ্ট, তখনও তাঁকে দাঁড় করিয়ে হাতকড়িতে ঝুলিয়ে রাখতে কর্তৃপক্ষের সঙ্কোচ বোধ হয়নি। ফলে দেখতে দেখতে আবার অনশন ধর্মঘট শুরু হল। এবার কর্তৃপক্ষের শত সাবধানতা সত্ত্বেও ইন্দুভূষণ, উল্লাসকর, ননীগোপালের কথা দেশের কানে এসে পৌঁছাল। দেশের কাগজে লেখালিখি শুরু হল।

দেশ থেকে ননীগোপালের দাদাকে আনিয়ে অনেক বোঝানো হল কিন্তু তিনি ভুখা হরতাল বন্ধ করতে রাজি হলেন না। জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আবারও বারীন এবং উপেন নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁকে অবশেষে অনশন তুলে নিতে রাজি করান। ধর্মঘট শেষ হল। ননীগোপাল মুখার্জী সর্বমোট ৭২ দিন অনশন ধর্মঘট করেছিলেন এবং ৬ ডিসেম্বর, ১৯১২-তে তা প্রত্যাহার করেন।

এই ধর্মঘটের ফলে রাজবন্দিরা কিছু সুবিধা অর্জন করলেন। তাঁরা জেল থেকে সুপারিন্টেন্ডেন্টের অনুমতিক্রমে সেলে বই আনার অনুমতি পেলেন। এই সময় রাজবন্দিদের কাজকর্মের পাশাপাশি একসাথে বসে কথাবার্তা আলাপ আলোচনার সুযোগ দেওয়া হল এবং তাঁদের প্রতি একটাই শর্ত রাখা হল যাতে তাঁরা ভবিষ্যতে কোনো ধরনের ধর্মঘটে না যান।

ধর্মঘটিদের দাবি মেনে যাঁরা মেয়াদি সাজাপ্রাপ্ত, তাঁদের মূল ভূখণ্ডে, ভারতবর্ষের জেলে ফেরত পাঠানো শুরু হল। ২৩ মে, ১৯১৪ কলকাতার উদ্দেশ্যে এবং ১৮ জুন ও ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে তিনদফায় সমস্ত মেয়াদি রাজবন্দিদের আন্দামান থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হল দেশের বিভিন্ন জেলে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বন্দিরা – মোট চোদ্দজন – মুক্তি পেলেন না। তবে তাঁদের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করা হল। এঁরা এখন থেকে দলবদ্ধভাবে নিজেরা নিজেদের জন্য রান্না করে খেতে পারবেন আর এঁদের প্রেস, গ্রন্থাগার এবং মানচিত্র অঙ্কনের মতো হাল্কা কাজ দেওয়া হবে।

গদর বিপ্লবীদের আগমন – অত্যাচার

১৯১৫-১৯২১। নতুন করে রাজবন্দিদের ঢল নামল সেলুলার জেলে। এবার গদর বিপ্লবীরা আসতে শুরু করলেন সেলুলারে। এঁদের অধিকাংশই পাঞ্জাবি শিখ। ১৯১৭-তে দ্বিতীয় মান্দালয় কেসে বার্মা থেকে এলেন রামরাক্ষা নামে একজন পাঞ্জাবি ব্রাহ্মণ। কালাপানিতে পৌঁছাবার পর কয়েদিদের মধ্যে যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁদের পৈতে কেড়ে নেওয়া হত। তিনি এই পৈতে কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদ করলেন। তিনি কারাধ্যক্ষকে বললেন যে পৈতে না থাকলে পান ভোজন করা তাঁর ধর্মে নিষিদ্ধ। সুতরাং পৈতে কেড়ে নিলে তিনি জেলখানার অন্ন গ্রহণ করবেন না। এরপর তিনি পানাহার ত্যাগ করলেন। চারদিন এভাবে চলার পর জোর করে তাঁর নাকে রবারের নল পুরে পেটে দুধ ঢেলে দেওয়া শুরু করল জেল কর্তৃপক্ষ। মাসাধিককাল এইভাবে চলল। তখন একটা ধর্মঘটের প্রস্তুতি তলায় তলায় শুরু হয়ে গিয়েছিল। রামরাক্ষাও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা চালাতে থাকলেন। এমনিতেই তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য ছিলেন। এবার তিনি আক্রান্ত হলেন যক্ষ্মারোগে। চিকিৎসার জন্য তাঁকে পাঠানো হল জেল-হাসপাতালে। অল্পদিন পরে সেখানেই তিনি মারা গেলেন।

নতুন বন্দিদের প্রতি সেই একই ব্যবস্থা, একই নিয়মকানুন। এখানে কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলবে না। স্নানের জন্য বরাদ্দমাফিক সমুদ্রের নোনা জল। এখানে চুল নিয়ে সবথেকে বিপদে পড়লেন শিখেরা। চুল রাখতে গেলে যে যত্ন নিতে হয়, সাবানের প্রয়োজন হয়, তার থেকে তাঁরা বঞ্চিত। চুল পরিষ্কার করার জন্য সাবানের বদলে একধরনের রাসায়নিক তরল দ্রব্য পেতেন যা কোনো কাজের নয়। অনেকসময় কেউ কেউ লুকিয়েচুরিয়ে বাইরে থেকে সাবান আনাতেন। তবে ধরা পড়লে সর্বনাশ! তখন শাস্তি হিসাবে বরাদ্দ হত ৬-মাসের ক্রশ ফেটারস এবং ৭-দিনের হাত উঁচু করে দুই পা ফাঁক করে সারাদিনের জন্য দাঁড়াবেড়ি।

খাবারের অবস্থাও তথৈবচ। কিন্তু এবারে একটা অসুবিধে দেখা দিল, বিশালদেহী শিখ বন্দিদের তো এতে পেট ভরে না। খাবারের পরিমাণ যাই হোক না কেন, কাজের পরিমাণ কিন্তু কমে না। চার-পাঁচজন ছাড়া ঘানিতে কাউকে জোতা না হলেও ছোবড়া পেটানোও কম পরিশ্রমের কাজ নয়। সকাল ৮-টা থেকে বিকেল ৪-টা পর্যন্ত কাজ করে দিনের কোটা পূরণ করতে না পারলে আরও বেশি সময় কাজ করতে হত, তার সঙ্গে জুটত মারধোর এবং কুৎসিত গালাগালি। এমনকি কেউ অসুস্থ বোধ করলেও তার মুক্তি নেই এই শ্রমসাধ্য কাজ থেকে। এর ওপর ধার্য করা হত নানা ধরনের শাস্তি – উলঙ্গ করে বেত দিয়ে চাবকানো, ছ' মাসের জন্য ডাণ্ডাবেড়ি, সাতদিনের জন্য প্রতিদিন আটঘন্টা করে দাঁড়াবেড়ি।

পাঞ্জাব থেকে আসা মার্শাল ল'য়ের আসামিদের জুতে দেওয়া হল তেলের ঘানিতে। তাঁরা সত্যাগ্রহের নীতি মেনে প্রতিবাদ জানালেন। জেলারের নির্দেশে তাঁদের হাত ও পা বেঁধে ঘানির হ্যান্ডেলের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। ওই অবস্থায় সেই ঘানি ঘোরালো সাধারণ কয়েদিরা। এর ফলে ঘানির সঙ্গে বদ্ধ অসহায় মানুষগুলোর হাত ও পিঠ মাটির সঙ্গে ঘষটে ক্ষতবিক্ষত হল।

নির্জন কারাবাস থেকে শুরু করে মারাত্মক সব শাস্তি বরাদ্দ ছিল প্রতিবাদীদের জন্য। সব থেকে নৃশংসতা ছিল যখন কাউকে ছোটো একটা লোহার খাঁচায় বন্দি করে রাখা হত। এই খাঁচাগুলি এতটাই ছোটো ছিল যে তাতে কারও পক্ষে সোজাভাবে দাঁড়ানো, শোওয়া এমনকি বেশি নড়াচড়া করা সম্ভব ছিল না। এই খাঁচাগুলিতে অনেককে চব্বিশ ঘন্টারও বেশি সময় আটকে রাখা হত। মাস্টার ছাত্তার সিং, অমর সিং, জ্বালা সিং এবং লাল সিং'কে এক বছরেরও সময় ধরে এই ধরনের খাঁচায় আটকে রাখা হয়েছিল।

সাহসী প্রতিরোধ

গোলমাল শুরু হল ঝাঁসীর পরমানন্দকে নিয়ে। প্রথম দিন থেকেই পরমানন্দ ঝাঁসির সঙ্গে ঝামেলা

লেগে গেল কলুতে কাজ করা নিয়ে। পরমানন্দ তেল পেষাইয়ের কাজ করতে অস্বীকার করলেন। এক টিন্ডেল তাঁকে ব্যারী সাহেবের অফিসে ধরে নিয়ে গেল তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে শাস্তির হুকুম আনতে। পরমানন্দ কাজ করতে চাইছেন না শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন ব্যারী, তার মুখ থেকে বাছা বাছা গালি বেরিয়ে এল। পরমানন্দও কম যান না। তিনিও উত্তরে ব্যারী সাহেবের উদ্দেশ্যে এমন চোখা চোখা গালি প্রয়োগ করলেন যা আগে কখনো সাহেব শোনেননি। সাহেব মারাত্মক রেগে গিয়ে ঝাঁসিকে মারার জন্য উদ্যত হতেই বিশালদেহী ঝাঁসি ব্যারীর পেট লক্ষ্য করে এমন লাথি কষালেন যে সাহেব ছিটকে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওখানে উপস্থিত চাটুকার ওয়ার্ডার ও টিন্ডেলরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝাঁসির ওপর এবং সবাই মিলে তাঁকে পেটাতে শুরু করল যতক্ষণ না পর্যন্ত ঝাঁসির মাথা ফাটে। পরে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। এরপর ঝাঁসিকে তাঁর কুঠুরিতে আবদ্ধ করা হল। জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, মেজর মারে ঘটনার তদন্ত করে কুড়ি ঘা চাবুকের শাস্তি বরাদ্দ করল। চাবুকের মারে ঝাঁসি ক্ষতবিক্ষত হলেন কিন্তু অত যন্ত্রণার মধ্যেও এতটুকু নত হলেন না। এরপর তাঁকে ছ'মাসের জন্য ডাণ্ডাবেড়িতে আবদ্ধ করে নির্জন কারাবাস ও 'কঞ্জি' ভক্ষণের শাস্তি হল। পরমানন্দের এই শাস্তিতে বিদ্রোহের ফুলকি দেখা দিল, ধর্মঘট শুরু হল কিন্তু জেলার সবাইকে বুঝিয়েসুঝিয়ে পরমানন্দের শাস্তি প্রত্যাহার করার আশ্বাস দিয়ে তখনকার মতো ধর্মঘট ভেঙে দিল।

পরমানন্দের শাস্তি প্রত্যাহারের জেলারের আশ্বাস যে ভাঁওতা তা ক'দিনের মধ্যেই বোঝা গেল। পরমানন্দের শাস্তি একইভাবে বহাল রইল। ১৩ই জানুয়ারি, ১৯১৬, পরমানন্দের শাস্তি প্রত্যাহারের দাবিতে নতুন করে ধর্মঘট শুরু হল। এবার ধর্মঘটিদেরও পড়তে হল একই ধরনের দণ্ডের সামনে। তাঁদেরও ডাণ্ডাবেড়ি ও দাঁড়াবেড়িসহ ছয়মাসের নির্জন কারাবাসের শাস্তি হল। লায়ালপুরের মাস্টার ছাত্তার সিং, যিনি খালসা কলেজের এক ব্রিটিশ আধ্যাপককে খুনের চেষ্টার অভিযোগে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে আন্দামানে এসেছিলেন তিনি একদিন জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট মারে সাহেবকে চড় মারলেন। সাহেব চেয়ার থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডার এবং পেটি অফিসাররা ছাত্তারকে মারার জন্য ছুটে এল কিন্তু অন্যদিকে রাজবন্দিরাও ছুটে এল ছাত্তারকে বাঁচাতে। জেলের ভেতরে দুই দলের মধ্যে মারপিট বাঁধে আর কি, ভয়ের চোটে মেজর মারে তার বাহিনীকে আটকালেন। এর পর একটা ছোটো লোহার খাঁচায় দু' বছরের বেশি তাঁকে আটকে রাখা হয়। পরে সোহন সিং ভাকনা অনশন ধর্মঘট করে ছাত্তার সিংকে খাঁচাবন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করেন।

গদর বিপ্লবীদের অন্যতম নেতা, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দশ বছরের নির্বাসন দণ্ড নিয়ে বাবা ভান সিং এখানে এসেছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিল না আর বয়সও নেহাৎ কম ছিল না। তাঁকে সেদিন ৩ পাউন্ড নারকেলের তার দিয়ে তিন পাউন্ড দড়ি দেবার কাজ দেওয়া হয়। দেবার ও নেবার সময় ওজন করার নিয়ম। তারগুলো যদি ভেজা থাকে তাহলে দড়ি বানাবার সময় শুকিয়ে গিয়ে ওজন কম হত। সেদিনও অমন ঘটল। দড়ি নেবার সময় ওজনে তা কম হল। সেই নিয়ে শুরু হল বচসা। তখন এক ব্রিটিশ কনস্টেবল তাঁকে অপমান করল ও কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করল, ভান সিংও সমানভাবে সেই কনস্টেবলটিকে গালাগালি করলেন। এই অপরাধে তাঁর ছয়মাসের দাঁড়াবেড়ি, কম খানা ও নির্জন কারাবাসের দণ্ড হল। তাঁকে তাঁর কুঠরিতে দেয়ালের সঙ্গে আঁটা বেড়িতে ঝুলিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হল এবং খাবারের বরাদ্দ পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হল। ভান সিং যদি কখনো বা বসার সুযোগও পান, সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা জেলার ব্যারী সাহেব তাঁর কুঠুরির সামনে এলে তিনি তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্য দাঁড়াতেন না, কখনও বা পেছন ফিরে থাকতেন। এ অপরাধের জন্য জেলার প্রথমে তাঁকে গালি দিত, তিনিও তার পরিবর্তে

সেলের সামনে টানা বারান্দা।

(চিত্রগ্রাহক – লেখক)

গালি দিতেন। এরপর ব্যারী সাহেব যখন সেখানে যেতেন তখন পাঁচ-ছয়জন প্রহরী বলপূর্বক তাঁকে হাতকড়ি পরিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখত। তখন তিনি বলপ্রয়োগ করতেন বলে তাঁকে প্রহারও করা হত।

জুন ১৯১৭। সেদিন সকাল দশটা। ভান সিং একা সেলের মধ্যে প্রবল আবেগের সঙ্গে গান ধরেছেন আর মোটা হাতবেড়ি বাজিয়ে তাল দিচ্ছেন। এমন সময় ব্যারী সাহেব এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভান সিং! ক্যায়সা হ্যায়?" একথা শোনামাত্রই ভান সিং তাকে গালি করে গায়ের জ্বালা মেটালেন। সেইসময় ব্যারী সাহেব লক্ষ্য করলেন যে সমস্ত বন্দিরা যে যাঁর সেলে তালাবন্ধ আছেন, চারদিক নিস্তব্ধ। বাবা ভান সিংয়ের গালি তো সবাই শুনতে পাচ্ছেন। ব্যারী সাহেবের অহংয়ে লাগল। তিনি জমাদারদের ডেকে ভান সিংকে মারার নির্দেশ দিলেন। ব্যারীর উপস্থিতিতে জমাদাররা প্রবল উৎসাহে ভান সিংকে মারতে লাগল। ভান সিংকে সেদিন এমনভাবে মারা হয়েছিল যে তাঁর শরীর আর তা নিতে পারেনি। প্রায় মাসখানেক ভুগে চিরতরে চলে গেলেন বাবা ভান সিং।

বিভিন্ন বিপ্লবীদের মধ্যে সংযোগের সমস্যা ছিল। তাঁরা জেলের সাতটি ব্লকে ছড়ানো। তবু তাঁরা উপায় বের করে ফেললেন, সাধারণ কয়েদি, যাদের যে কোনো ব্লকে যাতায়াতের অনুমতি ছিল, তাদের সাহায্যে অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা গেল। সিদ্ধান্ত হল এভাবে বাবা ভান সিংয়ের মতো যদি সবাইকে মরতেই হয়, তাহলে লড়াই করে মরাই ভালো। শুরু হল নতুন করে ধর্মঘট। সেই সময় রাজনৈতিক বন্দিরা সংখ্যায় ছিলেন প্রায় নব্বইজন, যাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই পাঞ্জাব থেকে আসা গদর বিপ্লবীরা।

ধর্মঘটে যোগ দেওয়া রাজবন্দিরা ছয় মাসের বেশি ভারী হাতকড়া ও শিকলবন্দি হয়ে থাকায় তাঁদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। অনেকের মধ্যে টিবি রোগ বাসা বেঁধেছে, অনেকে উন্মাদ হয়ে গেলেন, এদিকে মৃত্যুর হার বেড়ে চলল। জেল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হল তাঁদের কিছু দাবি মেনে নিতে। কথা দেওয়া হল যে এবার থেকে তাঁদের স্নানের জন্য পরিশ্রুত জল, সাবান ও তেল সরবরাহ করা হবে, বাড়িতে লম্বা চিঠি লেখার সুবিধা দেওয়া হবে, উন্নতমানের ও পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার দেওয়া হবে এবং তাঁদের জন্য হাল্কা কাজ বরাদ্দ করা হবে। এবার তাঁরা ধর্মঘট তুলে নিলেন।

মুক্তি এল অবশেষে

ব্যারী সাহেবের অহং ভেঙে চুরমার। পোর্ট ব্লেয়ারের 'ভগবান' এখন শুধু একটা 'প্রস্তরখণ্ড'এ পর্যবসিত। ব্যারী সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং সেলুলার জেল থেকে বিদায় নিলেন ও পরবর্তীকালে ভারতেই দেহরক্ষা করলেন। আরেকজন অত্যাচারী ওয়ার্ডার যে 'ছোটো ব্যারী' নামে কুখ্যাত ছিল সেই মিরজা খান প্যারালিসিসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল।

জেল কর্তৃপক্ষের ব্যবহার সম্পূর্ণ ভাবে বদলে গেল। তারা আর রাজনৈতিক বন্দিদের সঙ্গে কোনো ধরনের ঝামেলায় জড়াতে চাইলেন না। এখন বই বাঁধাই ও প্রিন্টিং প্রেসে তাঁদের কাজ দেওয়া হল। তেলের ঘানি আর ঘোরে না। বন্দিরা এখন গ্রন্থাগারে পড়াশুনা করেন, খবরের কাগজ তাঁদের পড়তে দেওয়া হয় এবং তাঁরা এখন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা ও আলোচনা করতে পারেন।

সন ১৯১৮। কলকাতার *মডার্ন রিভিয়্যু* কাগজে সেলুলার জেলে রাজবন্দিদের দুর্দশা নিয়ে একটা চিঠি প্রকাশিত হল। সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ল। পরপর বিভিন্ন সংবাদপত্র সেলুলার জেলের অবর্ণনীয় অবস্থা নিয়ে লেখালেখি শুরু করল।

এবার সরকার নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হল। ২৫শে জুলাই। স্যার আলেকজান্ডার কারডিউয়ের নেতৃত্বে 'Indian Jails Committee (1919-20)' এল আন্দামানে সেলুলার জেল পরিদর্শন করতে।

বন্দি পরিবাহী জাহাজ, এস এস মহারাজা। (নেটচিত্র)

এই কমিটির কাছে রাজবন্দিরা তাঁদের ক্ষোভের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে স্মারকলিপি দিল।

ওইদিকে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় রাজবন্দিদের আন্দামান থেকে ফিরিয়ে আনার দাবি জোরদার হল। ইতিমধ্যে রাওলাট অ্যাক্ট প্রত্যাহৃত হবার ঠিক পরপরই ডিসেম্বর ১৯১৯-এ আন্দামানে সেলুলার জেল বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিল সরকার। ইংল্যান্ডের রাজা মন্টেগুর সাহায্য নিয়ে 'রাজকীয় ক্ষমা' (Royal Amnesty)-র কথা ঘোষণা করা হল। তৎকালীন ভাইসরয়, চেমসফোর্ডের আপত্তি সত্ত্বেও মন্টেগুর ব্যবস্থাপিত রাজবন্দিদের এই কারামুক্তির বিষয়টা ভারত সরকারকে মেনে নিতেই হল। ভারতের বিভিন্ন জেল থেকেও এই সময়ে রাজনৈতিক বন্দিরা মুক্তি পেলেন। সরকারি নির্দেশ এসে পৌঁছাল সেলুলার জেলে। প্রথমেই মুক্তি দেওয়া হল পাঞ্জাব ও গুজরাট থেকে মার্শাল ল' মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত রাজবন্দিরা। এরপর একে একে মানিকতলা, লাহোর এবং বারাণসী ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত আটক রাজবন্দিরা। বারীন ঘোষ, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, ভাই পরমানন্দ সহ প্রায় ১৫ জন মুক্তি পেলেন সেলুলার জেলের অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাবাসের হাত থেকে।

বেশিরভাগ রাজবন্দিরা মুক্তি পেলেও সাভারকর ভাইরা সহ প্রায় জনা তিরিশেক রাজবন্দি মুক্তি পেলেন না। পরে ১১ই মার্চ, ১৯২১ ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব কেন্দ্রীয় আইনসভায় এক বিবৃতিতে জানালেন যে, আন্দামানে পেনাল সেটেলমেন্ট বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এবং ভবিষ্যতে আর কোনো রাজনৈতিক বন্দিকে সেলুলার জেলে পাঠানো হবে না। এই ঘোষণা মতে সাভারকররা দুই ভাইসহ বাকি রাজবন্দিরা আন্দামান থেকে, যে জাহাজে করে তাঁরা বর্বরতার শিকার হতে সেলুলার জেলের অন্ধকার জগতে প্রবেশ করেছিলেন, সেই 'এস এস মহারাজ' তাঁদের কালাপানি থেকে ভারতভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে এল।

যে সমস্ত রাজবন্দিরা ভারতে ফিরে এলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে মুক্তি পেলেন, অনেকে আবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলে ঠাঁই পেলেন। আন্দামান সেলুরার জেল বিপ্লবী রাজবন্দিদের জন্য ওই মুহূর্তে তার লৌহকপাট বন্ধ করল।

Sailendra Nath Ghose – The Revolutionary who could have been a Scientist

Anirban Kundu
Professor, Department of Physics, University of Calcutta

Sailendra Nath Ghose, also known as Sailen Ghose, was a fascinating personality. He could have been one of the pioneering experimental physicists of India. He could have been a celebrated professor of Calcutta University, whose name would have been uttered at the same breath as those of Satyendra Nath Bose and Meghnad Saha. As an undergraduate student, he had offers that would make every undergraduate student of India drool now. But he chose a different path, or, to be more precise, fate took him in a completely different direction. He became, ultimately, one of the brightest names among those who supported the Indian freedom movement from outside India. He also had close connection with Irish revolutionaries, the *Sinn Fein*, and their leader, Éamon de Valera. This is a brief story of a revolutionary whom everyone forgot. Most of the material comes from his short autobiography that came out in three parts in the *Asia* magazine, published from the US, in 1927.

Sailen's ancestral home was in Kurigram, Jessore, where his father Jadunath Ghose was a school teacher. He was born at his maternal home in Senhati village of Khulna district, on November 3, 1892. Thus, he was about a year senior to the celebrated duo of Satyendra Nath Bose and Meghnad Saha, but they were all batch mates.

Sailen's true inspiration was his elder cousin, Ramendra, who was a physics teacher at the Ravenshaw College, Cuttack. Ramendra and his wife had no issues, so when they moved to Cuttack, he took his own brother and this young cousin with him. Ramendra not only admitted Sailen to a local school, but also used to bring instruments and equipment from his college laboratory to show him how physics experiments work. This started Sailen's love affair with experimental physics. This is also where Sailen first thought of becoming a revolutionary. He spent six years in Cuttack.

In October 1907, there was a devastating flood in Mahanadi, and Cuttack was severely inundated. Sailen and his friends started relief works. Precisely at this time, Sailen met a young gentleman (whose name he never divulged) who convinced Sailen that the British would never understand the language of appeals and deputations. It had to be an armed revolution. And for that the country would need scientists. Sailen was already fascinated by experiments, this came as an extra motivation.

He first wanted to study Chemistry, because the knowledge would have been helpful in making bombs. But then he changed to Physics, and the reason, in his own language, was: "Afterwards, physics claimed my attention, because of the need for some device by which bombs could be exploded without injury to the person handling them. I became interested in the problem of setting a bomb by wireless waves, and, after I had taken my master's degree at the university, I was actually engaged in trying to work out

a method of generating electricity by forced induction. The study of wireless, I should add, was forbidden in India. Hence study abroad would be, I knew, of particular value to me."

Let us just stop and think for a moment. Here is a young revolutionary, who wants to study physics just with the dream of making remote controlled bombs. Such bombs can be made anywhere now, but it was not easy more than 100 years ago. He had to pay the price, and what a price it was!

In Matriculation, Sailen stood third in entire Orissa, and stood second in Intermediate. Ramendra had moved to Krishnanagar by that time. Sailen also decided to move to Calcutta and get admitted to Presidency College. Even at that time, it was not easy; there was a long waiting list, but finally Sailen succeeded.

At that time, the Physics department of Presidency College was synonymous with Sir J.C. Bose, but there were two other competent British teachers, Harrison and Peake. Sailen became close to Harrison, as he was also an experimentalist. Together, they wrote a paper in the journal of the Astronomical Society of India, analysing the properties of a meteorite that fell in north India some time ago. Even for a glorious department like Presidency physics, this is perhaps the first instance of a paper by a student.

Sailen also saved Harrison once from the wrath of the students. Harrison made some unsavoury comments and the students were adamant for his resignation (this was a few years before the incident involving Subhas Bose and E.F. Oaten). Sailen acted as the mediator, and Harrison escaped after rendering an apology. One of the leaders of the agitating students was Satyen Bose.

Harrison often left the key of the laboratory with Sailen, who used to spend a lot of his free time there (although at this time he was secretly associated with the revolutionaries, to which we will come later). Sailen's thesis paper for his M.Sc. degree was named 'Some properties of iron deposited electrically in a magnetic field.' The experiment was strenuous and Sailen had to spend many sleepless nights, taking data at one-hour interval for fifteen consecutive days.

Sailen was in Presidency from 1911 to 1915, when he graduated with first class in Physics. In the same year, the first two places in Mixed Mathematics went to Satyen Bose and Meghnad Saha.

Sir Asutosh Mookerjee, the Vice-Chancellor *sans pareil* in the history of Calcutta University (CU), was in the process of establishing the science departments in the university. The Physics department started in 1916. Physics being an experimental subject, the laboratories are essential components for the course. Asutosh handpicked Sailen to set up the M.Sc. Physics laboratories. Sailen was asked to look at the undergraduate colleges of Calcutta, to find out whether there were unused instruments that can be procured to start the postgraduate laboratories. He got some very positive response from the then Maharajah of Cossimbazar, Sir Manindra Chandra Nandy, who agreed to give away such unused instruments in the laboratory of his college (now known as Manindra Chandra College). This was the first step of establishing the teaching laboratories of the Physics department, which was later taken up by Sir C.V. Raman. Sailen had already fled India by that time.

Another good news came in May 1916. Sailen got a fellowship from Sir Taraknath Palit Trust (Palit being one of the major forces behind the establishment of Science College), to spend three years in the US. He was supposed to get his Ph.D within this time. The only condition was that he should not get married within this time. Sailen got a chance to be in Harvard, and a teaching job in the Physics department of CU was almost guaranteed upon his return.

The excited young man got his passport, bought the tickets, and on a July Wednesday, was all set to catch the train to Bombay, from where the ship to the US would set sail on

Saturday. Two days before, on Monday, a police officer came to his place, confiscated the passport, and told Sailen that he was forbidden to leave India.

Sailen was stunned. He had no idea why (he was not associated with any revolutionary group for some days), and he went to Sir Asutosh, who, in spite of his connections, could not find out the reason for such an embargo. Even a phone call to the then Viceroy, Lord Chelmsford, failed to shed any light. Asutosh only came to know that there was indeed such a restriction, but the cause was not revealed even to him.

Police went after Sailen. They went to Science College with the summons for him to meet and surrender to the Commissioner of Police (CP) of Calcutta, and he would be sent to the Andamans. The confused Sailen went to meet the CP to clear up the confusion, but was driven away by the clerk. Probably they did not have any documents against him. He was asked to go to Kyd Street. Sailen thought he would better go to Science College, but met a friend who told him not to venture there as the police were waiting for him.

That evening, Sailen, confused to the extreme and his dreams on the point of shattering, went to meet Sir Asutosh again. Asutosh was like a father figure in Sailen's life.

Asutosh advised him to flee. Calcutta had been too hot for him. He should behave like a true man and never surrender. Sailen deserted his living place in Calcutta, and went to meet his old friends, the revolutionaries, who took him in their arms.

One should go back a few years to know why Sailen's life took such a topsy-turvy course. Sailen was, of course, involved in the freedom movement when he was in Presidency College. At that time it was quite common among the college students; some were actively involved in the *swadeshi* movement, and almost everyone supported indirectly. There were a handful of police informers too, but they often met with a terrible end. For example, during Sailen's time, a Presidency student residing at the Eden Hindu Hostel was suspected to be a mole. A few days later his corpse was discovered inside the hostel, a mysterious death by poisoning.

Even in those days of all-powerful British rulers, the college principals could look at the rulers straight in the eyes. The principal of Presidency College, Henry Rosher James, a historian of repute, never allowed the poilce to enter the college without his permission. A lot of times this helped the students, who had ample scope to hide the dangerous documents, before the police could finally arrange for the permission. Sailen himself wrote about a few such incidents, he was one of the topmost student leaders.

When he first joined the freedom movement, in 1912-13, Sailen was a follower of Gopal Krishna Gokhale. He used to spend a lot of time educating illiterate children. During these years, Indian freedom struggle was witnessing a qualitative change. Earlier the style was mostly the lone wolf attack on the British administrators, from that of Kshudiram Bose and Prafulla Chaki to Basanta Biswas, who hurled a bomb towards the then Viceroy, Lord Hardinge. During 1913-14, a proposal to bring all revolutionary outfits under a single umbrella first took shape.

The first world war started at this time, and the Bengali freedom fighters planned to take help from the Germans to oust the British. The leader of the combined front and mastermind behind the entire plan was Jatindranath Mukhopadhyay, also known as *Bagha Jatin* (Jatin the tiger).

Sailen was a close associate to Jatindranath, under whose leadership a daring scheme was planned by the members of the Jugantar party and the Ghadar party --- fighting the British with German weapons brought from the US through the far east. The plan got the nod from Berlin, and the German consulate in the US was actively helping. This is known as the Hindu-German conspiracy. Jatindranath sent a few comrades to Java, to discuss the

modalities with the officers of the German navy. One of them was Manabendra Nath Roy. We know that this plan did not succeed. The weapons were supposed to land at the Orissa coast, but Jatindranath himself was killed there in the battle of Buribalam. The Hindu-German conspiracy trial went for a long time in the US. The Indian counterpart was the first Lahore conspiracy case.

It was unknown to Sailen, but he got marked as one of the right-hand men of Jatindranath in the Hindu-German conspiracy case.

To come back to our story, Sailen went back to the revolutionaries in July of 1916. There was a meeting on the 14th of August in a place near Calcutta, where almost all the leading revolutionaries were present. Police got informed and surrounded the place. The fighters escaped with volleys of firing. None got hurt except Sailen, although some of the policemen were killed.

When Sailen recovered from his wounds and came back to Calcutta, he found that the police were madly looking for him, with a price of 25000 rupees on his head. The actual cause now came to the light. The US police, under the request of their British counterpart, searched the office of von Bopp, the German ambassador in the US. They seized a number of documents on the Hindu-German conspiracy, and some of them contained Sailen's name as one of the main conspirators. Thus, Sailen's plan of going to the US really stirred the British.

This forced Sailen's hand. He got his last help from Sir Asutosh when he referred Sailen to a stevedore of the Kidderpore dock. After trying for some time, Sailen ultimately succeeded to board a ship for Philadelphia, as a stoker. Manabendra Nath Roy was a co-passenger, who ultimately moved on to Mexico and established the communist party there. Sailen stayed in the US.

In the US, Sailen established an organisation called the Friends of Freedom for India (FFI), with Taraknath Das and some other former members of the Ghadar party. Not only they helped the Indian freedom struggle, but they also had a close contact with the Sinn Fein. They published a pamphlet of de Valera in 1920, which was dedicated to the Indian and Irish freedom fighters.

Thanks to Sailen's efforts, expatriate Indian and Irish freedom fighters came closer. In 1919, Lala Lajpat Rai gave a speech in Philadelphia in an Irish meeting. Next year, FFI arranged a big procession on St. Patrick's day, which was led by a mounted Sailen Ghose with a green and golden turban. They also brought out a pamphlet, with these lines at the beginning:

"Help India to liberty and independence. The British empire can alone be destroyed by separating India from it. Only independent India can save America, Ireland, Egypt, and the whole world from the British peril."

For a year, Sailen was the president of the US branch of the Indian National Congress. He was removed in 1930 under the order of Nehru and Gandhi, because he announced that Congress wants to liberate India with armed revolution.

Sailen then went to Mexico to work with M.N. Roy. He was there for a year, but fell out with Roy, and came back to the US, where he was finally caught and put in jail for four years. He came back to India in 1935 or 1936, under a general amnesty from the Government. He taught in the Brajamohan College in Barisal, and was then the principal of Jagannath College, Dacca. After independence, he was appointed as the Deputy High Commissioner of the Indian embassy in London, where he died on December 18, 1949.

There are very few freedom fighters with such an unfulfilled potential and yet such a colourful career. It is indeed a shame that he has been completely forgotten now. We can only hope that he won't remain so.

ব্যাঙ, পেনিসিলিন এবং বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র

কৃষ্ণেন্দু দেব
শিক্ষক, হাসনেচা হাই স্কুল (উচ্চ মাধ্যমিক)

প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে আমরা চিনি মূলত কীট-পতঙ্গ নিয়ে তাঁর অসামান্য গবেষণার জন্য। আসলে ছেলেবেলা থেকেই পোকা-মাকড়ের প্রতি ওঁর একটা অমোঘ আকর্ষণ ছিল। পরবর্তীকালে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে চাকরি নেওয়ার পর উনি হাজারো কীট-পতঙ্গ নিয়ে নিরলস গবেষণা করে গেছেন। ১৯৭৫ সালে তাঁর লেখা *বাংলার কীট-পতঙ্গ* বইটি রবীন্দ্র পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছিল। আর নালসো পিঁপড়ে এবং কান-কোটারি পোকা নিয়ে ওঁর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা তো আদায় করে নিয়েছিল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও।

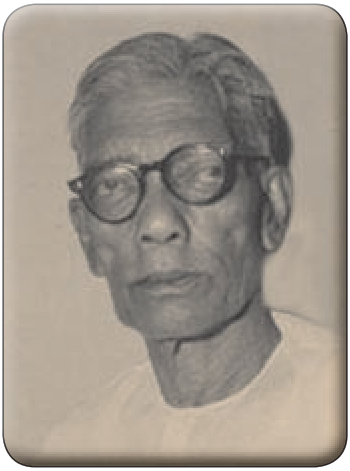

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৯৫-১৯৮১)

১৯৫১ সালে বোস ইনস্টিটিউটের ঠিকানায় গোপালচন্দ্রের নামে একটা চিঠি এসেছিল প্যারিস থেকে। সেখানকার ‘সামাজিক প্রাণী বিবর্তন’ গবেষণাগারের অধিকর্তা, একদা ফ্রান্সের ‘অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স’-এর সভাপতি, বিখ্যাত *Traite de Zoologie* গ্রন্থের রচয়িতা পিয়ের পল গ্রাসে (Pierre Paul Grasse) চিঠিটি লিখেছিলেন ফরাসি ভাষায়। ১৯৫১-র আগস্টে আমস্টারডামে ‘ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব এন্টোমোলজি’ চলার সময় কয়েকজন জীববিজ্ঞানী সামাজিক পতঙ্গদের নিয়ে গবেষণার জন্য একটা আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই সংগঠনের ফরাসি শাখা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ডাচ, ইতালিয়ানরাও এই সংগঠনে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সংগঠনের ভারতীয় শাখা প্রতিষ্ঠার জন্য গোপালচন্দ্রকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল ঐ চিঠিতে। কারণ পিয়ের মনে করেছিলেন এই ব্যাপারে ভারতবর্ষে গোপালচন্দ্রই যোগ্যতম ব্যক্তি। পিয়ের চেয়েছিলেন গোপালচন্দ্র যেন প্যারিসে ‘International Union for the Study of Social Insects’-এর সম্মেলনে যোগ দিয়ে ঐ ভারতীয় শাখার প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অমন একটা সম্মেলনে অনিবার্য কারণবশত অংশ নেওয়া সম্ভব হয়নি গোপালচন্দ্রের। তবে সেই অনিবার্য কারণটা কী ছিল তা কিন্তু রহস্যই থেকে গেছে।

ঐ বছরই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে স্কুলের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ছেলেমেয়েদের পড়ানোর উপযোগী বিজ্ঞান বই রচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। সেই জন্য বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষকে নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল একটা কমিটি। গোপালচন্দ্র ছিলেন ঐ কমিটির আহ্বায়ক। ওঁর উপর ভার পড়েছিল সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবই রচনা করার। গোপালচন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শেষ করেছিলেন সেই কাজ। সত্যেন বসু লিখেছিলেন

বইগুলোর ভূমিকা। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনস্থ স্কুলগুলোতে সবকটা বই-ই জায়গা করে নিয়েছিল পাঠ্য পুস্তক হিসেবে।

এই বই লেখার সঙ্গে গোপালচন্দ্র নিষ্ঠা ভরে তখন করে চলছিলেন *জ্ঞান ও বিজ্ঞান* সম্পাদনার কাজও। তবে সেই জন্য কিন্তু বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণার কাজে ঢিলে পড়েনি। এই সময়ে গোপালচন্দ্রকে গবেষণার কাজে নাগাড়ে উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বোস (যিনি ডি এম বোস নামেই বেশি পরিচিত)। ভদ্রলোক একজন স্বনামধন্য পদার্থবিদ হলেও বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে ওঁর আগ্রহ এবং পড়াশোনা ছিল। তাই উনি বোস ইনস্টিটিউটের ডিরেকটর হওয়ার অনেক আগেই একবার গোপালচন্দ্রকে বিখ্যাত ফরাসী কীটতত্ত্ববিদ ফ্যাবারের বই (*Fabre's Book of Insects*, 1st Edition 1921) পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। গোপালচন্দ্রের সঙ্গে তখন সেই অর্থে ওঁর আলাপই ছিল না।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ হওয়ার পর ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বোস সব সময়ই গোপালচন্দ্রকে নতুন নতুন গবেষণাতে উৎসাহ দিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে পেনিসিলিন নিয়ে কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গত শতকের পঞ্চাশের দশকের একদম শুরুর দিকে ডঃ বোস একদিন গোপালচন্দ্রকে ডেকে বলেছিলেন যে ঐ সময়ে আমেরিকায় একটা নতুন জিনিস দেখা যাচ্ছে। ওখানে পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন ইত্যাদি অ্যান্টিবায়োটিক তৈরির কারখানা থেকে যেসব বর্জ্য ফেলে দেওয়া হয়, সেগুলো খেয়ে দেখা যাচ্ছে মুরগি আর শুয়োরেরা ওজনে খুব ভারী হয়ে উঠছে। গোপালচন্দ্র তো পিঁপড়ে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। তাই এই পরীক্ষাটা উনি ঐ পিঁপড়েদের ওপর করে দেখতেই পারেন।

এই পরামর্শ শুনে গোপালচন্দ্র আর বিলম্ব করলেন না, পিঁপড়ের ওপর পেনিসিলিনের প্রভাব নিয়ে শুরু করে দিলেন গবেষণা। বেশ কিছু দিন এই কাজ করার পর গোপালচন্দ্র লক্ষ্য করলেন পেনিসিলিন খাওয়া পিঁপড়েদের ডিম থেকে যেসব কর্মী পিঁপড়ে জন্মাচ্ছে, তাদের আকার সাধারণ কর্মীদের তুলনায় শতকরা ৬০ ভাগ ছোটো।

এই ফলাফল কিন্তু গোপালচন্দ্রের মনঃপুত হলো না। অতঃপর এবার ওঁর চোখ পড়ল পোষ্য ব্যাঙাচিগুলোর দিকে। আসলে ঐ সময়ে উনি সোনা ব্যাঙের ব্যাঙাচি নিয়েও কাজ করছিলেন। রানা টাইগ্রিনার (*Rana tigrina*) ব্যাঙাচিগুলোর দেহবর্ণের কোনো পরিবর্তন তার পরিবেশ অনুসারে হয় কিনা সেটা দেখার জন্য উনি অনেক ব্যাঙাচি বিভিন্ন কাচের ট্যাঙ্কে রেখে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। একদিন কী মনে হল, একটা ট্যাঙ্কে মিশিয়ে দিলেন পেনিসিলিন। ওদের ওপর এই অ্যান্টিবায়োটিকটার প্রভাব দেখার জন্য !

দিন দশেক বাদে দেখা গেল ঐ ট্যাঙ্কের মধ্যে থাকা ব্যাঙাচিরা আগের মতোই আছে, দৈহিক পরিবর্তন তেমন কিছুই ঘটেনি। অথচ অন্যান্য ট্যাঙ্কের ব্যাঙাচিরা অধিকাংশই লেজ আর বহিঃফুলকা খসিয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ হয়ে দিব্যি সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। এটা কেমন করে হলো? গোপালচন্দ্র আরও পনেরো দিন ঐ পেনিসিলিন মিশ্রিত ট্যাঙ্কে রাখা ব্যাঙাচিগুলোকে পর্যবেক্ষণ করলেন। না ব্যাঙাচিগুলো সেই আগের মতোই আছে, তাদের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ব্যাপারটা কী হচ্ছে সেটা ভালো করে বোঝার জন্য গোপালচন্দ্র আবার নতুন কয়েকটা ব্যাঙাচি নিয়ে ঐ একই পরীক্ষা শুরু করলেন। এবারেও একই ফল। কন্ট্রোলে (মানে সাধারণ জলে) রাখা ব্যাঙাচিগুলো ১০-১৫ দিনের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে রূপান্তরিত হচ্ছে কিন্তু পেনিসিলিন মেশানো ট্যাঙ্কে থাকা ব্যাঙাচিগুলোর কোনো বদল নেই। সেই সময়ে বিদেশ থেকে আসা অনেক বিজ্ঞানীই এই পরীক্ষা দেখে বিস্মিত হলেন। তাঁদের মধ্যে একজন গোপালচন্দ্রকে ঐ ট্যাঙ্কের জলে ভিটামিন B12 মিশিয়ে পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ দিলেন। গোপাল তা করলেনও। এবার দেখা গেল B12 প্রয়োগের ১২-১৩ দিন বাদে ২-৩টি বাদে ঐ ট্যাঙ্কের বাকি সব ব্যাঙাচিই পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হয়েছে।

এই অবস্থায় গোপালচন্দ্র আরেকটা কাজ করলেন। প্রায় চার মাস পেনিসিলিন মিশ্রিত ট্যাঙ্কে ব্যাঙাচি জীবন অতিবাহিত করেছে এমন কতকগুলি ব্যাঙাচির ওপর প্রয়োগ করলেন থাইরক্সিন নামের একটা হরমোন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো, এই থাইরক্সিন হরমোনের প্রভাবেই ব্যাঙাচির রূপান্তর (মেটামরফোসিস) ঘটে এবং তা পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হয়। এই সময়ে বোস ইনস্টিটিউটে হাজির হলেন ড. চেন (Dr. Ernst Boris Chain)। পেনিসিলিন নিয়ে বিস্তর কাজকর্মের জন্য তাঁকে বলা হতো 'পেনিসিলিন ম্যান'। উনি গোপালচন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন ব্যাঙাচিদের অন্ত্রে থাকা জীবাণুদের নিয়ে খোঁজখবর করতে।

গোপালচন্দ্র সেই পরামর্শ মতো কাজ শুরু করে দিলেন। সাধারণ জলে থাকা ব্যাঙাচিদের অন্ত্র কেটে পাওয়া গেল অন্তত দু'রকমের ব্যাকটেরিয়া (কক্কাস) যারা ভিটামিন B12 সংশ্লেষ করে। কিন্তু পেনিসিলিন ট্যাঙ্কে থাকা ব্যাঙাচিদের অন্ত্রে তেমন কোনো ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেল না। অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন ওদের মেরে ফেলেছিল।

এই পরীক্ষা থেকে কিন্তু অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। আসলে, আগেই বলেছি, ব্যাঙাচির পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে রূপান্তরকরণের জন্য থাইরক্সিন অপরিহার্য। এই হরমোনটা আবার ভিটামিন B12 ছাড়া তৈরি হতে পারে না। ব্যাঙাচির দেহে ঐ ভিটামিন সংশ্লেষ করে তার অন্ত্রে থাকা কিছু ব্যাকটেরিয়া। পেনিসিলিন যেহেতু ওদের মেরে ফেলে তাই পেনিসিলিন-মিশ্রিত ট্যাঙ্কে থাকা ব্যাঙাচিদের দেহে B12 সংশ্লেষ হয়নি। ফলে থাইরক্সিনও তৈরি হয়নি। আর তাই মেটামরফোসিস আটকে গেছে, তারা ব্যাঙাচি হয়েই থেকে গেছে মাসের পর মাস।

ব্যাঙাচির ওপর পেনিসিলিনের প্রভাব সংক্রান্ত এই পরীক্ষা নিঃসন্দেহে গোপালচন্দ্রের বিজ্ঞান গবেষণায় একটা মাইলফলক। এই গবেষণা কোনো বিদেশী বিজ্ঞানী ইউরোপ বা আমেরিকার ল্যাবরেটরিতে করলে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যেত। ১৯৫২ সালে, গোপালচন্দ্রের এই ব্যাঙাচি নিয়ে গবেষণা যখন মাঝ পথে, তখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ডের (WWF) প্রতিষ্ঠাতা, লন্ডনের জুলজিকাল সোসাইটির সম্পাদক, ইউনেস্কোর প্রথম পরিচালক, পৃথিবী বিখ্যাত ইভোলিউশনারি বায়োলজিস্ট স্যার জুলিয়ান হাক্সলে বোস ইনস্টিটিউটে এসেছিলেন। গোপালচন্দ্র তাঁকে কাচের বয়ামে রাখা অদ্ভুতদর্শন ব্যাঙাচিগুলো দেখান! পেনিসিলিনের প্রভাবে কারো পা নেই, কারো তিনটে পা, কারো বহিঃফুলকা নেই, আবার কারো লেজ বিলুপ্ত হয়নি। কোনো ব্যাঙাচি আবার অন্ধ! এসব দেখে হাক্সলেও বিস্মিত হন, মন্তব্য করেন, "ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়— একটা রিপোর্ট *Nature* পত্রিকায় দেওয়া উচিত।" কিন্তু সেই ফলাফল আর কখনোই *নেচার*-এ প্রকাশ করা হয়নি। তবে বিজ্ঞানী Rudolf Weber (1967) অবশ্য তাঁর *Biochemistry of Animal Development* বইয়ের একটি প্রবন্ধে গোপালচন্দ্রের এই গবেষণার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

আসলে ড. দেবেন্দ্রমোহন বোস বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ হবার আগেই গোপালচন্দ্রের কাজকর্ম সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। তাই পরবর্তীকালে গোপালচন্দ্রের ব্যাঙাচি নিয়ে গবেষণাতে তাঁর উৎসাহের ঘাটতি ছিল না। উনি ১৯৫৫-তে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্র স্মারক পুস্তিকাতে মোট পাঁচটি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেছিলেন। শেষ প্রকল্পটি সম্পর্কে ডঃ বোস লিখেছিলেন— "G C Bhattacharyya has opened up a new path in zoological research by his method of controlling the metamorphosis of amphibians like frogs from the larval (tadpole) state."

এখানে একটা বিষয় বলে রাখা জরুরি যে কুনোব্যাঙের ব্যাঙাচিকে পেনিসিলিনে রেখে যে ফল গোপালচন্দ্র পেয়েছিলেন, প্রকৃতিতে সাধারণ অবস্থাতেই কিন্তু তেমন ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। *Ambystoma* নামে এক ধরনের উভচর (ব্যাঙ) আছে যাদের দেখা পাওয়া যায় মেক্সিকোর

কিছু হিমশীতল লেকে। ওদের ব্যাঙাচিকে বলা হয় *Axoltol* লার্ভা। ডিম থেকে ঐ লার্ভা বের হয়ে ধীরে ধীরে বড়ো হয়। তারপর একসময় ওরা পূর্ণাঙ্গের মতোই ঐ জলে ডিম পাড়ে। সেই ডিম থেকে আবার নতুন *Axoltol* লার্ভা উৎপন্ন হয়। মানে এই প্রজাতির ব্যাঙেরা কোনোদিন আর ডাঙাতেই ওঠে না, তাদের কোনো পূর্ণাঙ্গ দশাও দেখা যায় না। বিজ্ঞানের ভাষায় এই ঘটনাকে বলে নিয়োটেনি (Neoteny) বা পিডোজেনেসিস (Pedogenesis)। কেন এমনটা ঘটে তা নিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক মতবাদ আছে। তবে সব ক্ষেত্রেই মূল কারণটা হলো *Axoltol* লার্ভার দেহে ঐ থাইরক্সিন হরমোন তৈরি না হওয়া। ঐ হরমোনের ঘাটতিই মেটামরফোসিস আটকে দেয়, *Ambystoma*-কে আর ডাঙায় উঠতে দেয় না। যাইহোক, ব্যাঙাচির ওপর পেনিসিলিনের প্রভাব নিয়ে গোপালচন্দ্রের কাজ যে সে যুগে আন্তর্জাতিক স্তরে বিজ্ঞানীমহলের সমীহ আদায় করে নিয়েছিল, তা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

এবারে ঐ ব্যাঙ নিয়ে একটা মজার গল্প বলে এই নিবন্ধে ইতি টানব। যে সময়ের কথা এতক্ষণ বলছিলাম, সেই সময়ে কিন্তু গোপালচন্দ্র ব্যাঙ নিয়ে আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। এক ভদ্রলোক কলকাতার বাইরে থেকে এসে তাঁকে ব্যাঙ সরবরাহ করতেন। ঐ মানুষটির ধারণা ছিল গোপালচন্দ্র নিশ্চয়ই রোজই ব্যাঙের মাংস খান, নইলে নিয়মিত অত ব্যাঙ কেনার দরকার পড়ে কেন। তবে সে কথা উনি কোনোদিনই মুখ ফুটে বলে উঠতে পারেননি, নিজের মনেই রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু একদিন ভদ্রলোক আর চুপ থাকতে পারলেন না। খুব নধর একটা ব্যাঙ গোপালচন্দ্রকে দিয়ে বলেই ফেললেন যে ঐ ব্যাঙটি অতি সুস্বাদু হবে, তাই উনি সেটার জন্য একটু বেশি দাম পাওয়ার আশা করছেন।

প্রত্যুত্তরে গোপালচন্দ্র অবশ্য কিচ্ছুটি বলেননি, শুধু মুচকি হেসেছিলেন।

Philanthropic P.C. Ray: A Relook

Manas Chakrabarty
Honorary Secretary, Indian Science News Association

August 2 every year reminds us of the great Indian savant, Acharya Prafulla Chandra Ray who was born on this date in 1861 in the village Raruli of Jessore (later Khulna) in the then Bengal Presidency (now Bangladesh). P.C. Ray was a remarkable man. He possessed a unique variety of virtues and treaded in almost all the domains of human interest with equal fervour and achievement. He was a great chemist, a greater teacher, a successful entrepreneur, a pioneer historian of ancient Indian science, a prolific bilingual writer, a true patriot and above all a great philanthropist. Pramathanath Bishi, a well-known litterateur and the then Rabindra Professor of Bangla of Calcutta University aptly described P.C. Ray as a dignified, "polite, amicable, affable and easily approachable, gentle, hospitable human being, with the heart of a Bengali mother." Let us travel down the memory lane to have a relook at philanthropic P.C. Ray in his 161st Birth Anniversary.

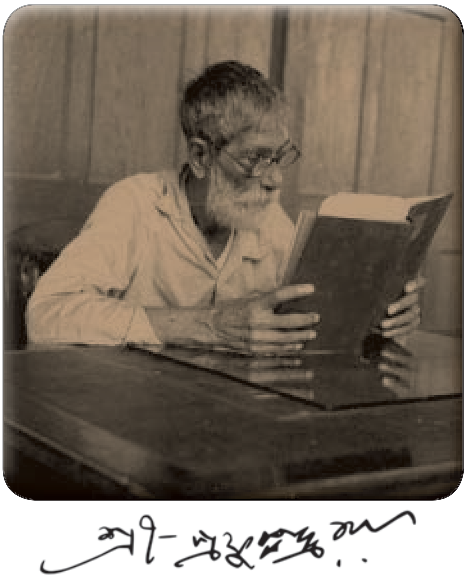

In order to appreciate the philanthropic inner being of P.C. Ray, it is rather necessary to know about his family background. He was born to Harish Chandra Ray, a cultured landlord, and Bhubanmohini Devi, the daughter of a local wealthy man. Harish Chandra had to drop out from his school because of the sudden death of his father. But he was a progressive man. He built a very expensive library at his home, set up two middle schools in his village, got his wife and sister educated at the village school, was attached to Brahmo Samaj and loved music. He was quite well known for his social activities. Whenever he went to Calcutta, he used to mingle with the then cultural leaders of Bengal. He was even a member of the British Indian Association. Brought up in this ambience, P.C. Ray acquired a spirit of kindness, magnanimity and a cultured outlook.

As a true philanthropist, he was vehemently against casteism and untouchability because he believed that casteism "has been a chief stumbling block in the growth of Indian nationality" and "is to a large extent responsible for the misfortune of Bengal." He strongly condemned "the inhuman hatred, fraud and falsehood that have been reigning

supreme in our society in the shape of caste system[1].”

P.C. Ray’s philanthropy could be observed right from his early days. In his boyhood at Raruli and later whenever he used to go to his village, he distributed sugar candy, barley and sago amongst the needy villagers[2]. In the case of natural disasters like earthquake, drought, famine and flood, P.C. Ray always took a leading role in the necessary relief work. By his own admission, “social service also has had a special attraction” for him and the distressed caused used to strike a sympathetic chord in his heart[3]. Throughout his life, P.C. Ray followed Swami Vivekananda’s ideal to wipe out all distinctions of caste and to uplift the ‘Daridra Narayana’[4].

It is P.C. Ray’s philanthropy that made him a gigantic donor throughout his life. Out of his salary at Presidency College and later at the University College of Science, he used to keep only a small amount for his livelihood, and he donated the rest to the poor and the needy. In 1915, he helped his student N.R. Dhar with Rs. 5,000/- when the latter was going to Europe for research as a State Scholar. In 1918, P.C. Ray delivered two lectures at the Madras University, and he donated his honorarium to the University to institute Weddeburn Prize of the University. He made a similar donation to the Punjab University.

In 1921, when P.C. Ray’s regular service ended, he accepted an extension up to 75 years only after he donated all his salary for the following 15 years (around Rs. 1.80 Lakh) to the University for creating monthly research scholarships and for the modernisation of the Chemistry department of the University. What a rare gesture! He also donated to the University a sum of Rs. 10,000/- in 1922 for instituting Nagarjuna Prize (for the best work in Chemistry) and a similar amount in 1936 for creating Sir Ashutosh Mukherjee Memorial Prize (for Biology – especially Zoology and Botany). He donated a sum of Rs. 10,000/- to the Indian Chemical Society, of which he was the founder President.

He used to donate regularly to nearly fifty institutions. He made handsome donations to City College, Calcutta, Sadharan Brahmo Samaj, Brahmo Girls’ High School, Calcutta, Bagerhat College (renamed Govt. P.C. College, now in Bangladesh), High School in Raruli (founded by his father), etc. One day he donated Rs. 3,000/- to Dr. Prafulla Chandra Ghosh for his Abhay Ashram and Rs. 500/- to a school at Baghil, the village of the maternal uncle (‘mesho’) of Sri Aurobindo, which rendered P.C. Ray’s bank balance zero at that point of time. Simply unthinkable! He also made a handsome donation to ‘Jenana’, a society in Jessore to promote education for women.

It is well known that P.C. Ray established Bengal Chemicals which later became Bengal Chemical and Pharmaceutical Works (BCPW) at Manicktala, Calcutta. He was also one of the Directors of this Company. But he never took any salary from this Company. He used to spend it mainly for the welfare of its employees. He had shares in this and some other Companies as well, but he used to donate the earnings from his shares mainly for the orphans and the needy widows.

As stated earlier, philanthropic P.C. Ray was always at the forefront in all kinds of relief work following natural disasters. One cannot forget the devastating 1922 flood in the Rajshahi Division, North Bengal following heavy rainfall during September 22-26. It was tagged as “the most terrific of its kind in the memory of the living generation[5].” It was also referred to in Narayana Gangopadhyay’s autobiographical novel *Shilalipi*[6]. Bengal Relief Committee was formed with P.C. Ray as its President, the University College of Science (Rajabazar Campus) as its headquarters and Professor Meghnad Saha, then a Professor at Allahabad University, as the Publicity Officer. The Committee could collect around Rs. 25 Lakh in cash and kind which was distributed amongst the flood-affected people. Although everybody associated with the Committee enormously contributed to the outcome, a

Special Correspondent of the Manchester Guardian made the remark that this huge response of the Bengalis was due “largely to Sir P.C. Ray’s remarkable personality and position.” P.C. Ray was also involved in subsequent floods in the Pabna district (now in Bangladesh) along with his students at the Bengal Technical Institute, of which he was the President, in 1929, North Bengal (same area as in 1922 flood) in 1931 and Midnapore in 1940. There is no wonder that Gandhiji tagged P.C. Ray as a ‘Doctor of Floods’.

During the pre-Independence period, India was primarily an agricultural country. P.C. Ray was expectedly concerned about the financial well-being of its peasantry. When Mahatma Gandhi preached for Charka (spinning) for the peasants, P.C. Ray was initially somewhat sceptical about its efficacy. But matured thought transformed him into a firm believer in Charka and Khaddar (hand-spun and hand-woven cloth) as a means of economic salvation of the agricultural labourers, the hapless widows and unmarried girls looking for earnings. He used to spend part of his earnings from his shares in different companies also for Charka and production of Khaddar.

Pertinently, P.C. Ray’s first independent research work on the adulteration of foodstuff (ghee and mustard oil) and his seminal synthesis of mercurous nitrite – both from Presidency College – were published in the *Journal of the Asiatic Society of Bengal*. Acharya P.C. Ray was no doubt famous for his synthesis of mercurous nitrite, his two-volume magnum opus *A History of Hindu Chemistry*, his autobiographies in English *Life and Experiences of a Bengali Chemist* (2 vols.) and in Bengali *Atmacharit*, his creations Bengal Chemical and Pharmaceutical Works, Indian Chemical Society, Indian Science News Association and the like. But the philanthropy of Acharya Prafulla Chandra Ray is equally proverbial. His selfless sacrifice was justifiably paralleled to that of Rishi Dadhichi.

This saintly man of Bengal passed away in the evening of June 16, 1944, leaving us in a void that cannot be replenished.

References

An Admiring Pupil, *Acharyya Prafulla Chandra Ray (Sir P.C. Ray) and His Many-Sided Activities*, Chuckervertty Chatterjee & Co. Ltd., 15, College Square, Calcutta, 1922/1923, pp. 33-40.

Amartya Kumar Dutta, ‘Acharya Prafulla Chandra Ray - Part-VI’, *Mother India*, LXVII (5), 408-417 (2014).

P.C. Ray, *Life and Experiences of A Bengali Chemist*, Vol. II, Chuckervertty, Chatterjee & Co., Calcutta, 1935, p. 359.

Prabuddha Bharat, May, 1931, pp. 243-244.

P.C. Ray, *Life and Experiences of a Bengali Chemist*, Vol. I, Chuckervertty Chatterjee & Co. Ltd., Calcutta, 1932, p. 249.

Narayan Gangopadhyay, *Shilalipi*, Bengal Publishers Pvt. Ltd., Calcutta, 1949.

A Note on Recent Excavation at Khana-Mihirer Dhipi (Chandraketugarh), District North 24 Parganas, West Bengal

Shubha Majumder, Rajkumari Barbina and Maneesh Verma
Archaeological Survey of India, Kolkata Circle

Location of the Site

The site known as Khana-MihirerDhipi/ Varahamihirer Dhipi(22°41′50.99′′N; 88°41′18.45′′E)forms part of the huge fortified township named Chandraketugarh and is located in the district of North 24 Parganas in the state of West Bengal. The Bidyadhari flows about 10 kilometres away from the site; however, a number of palaeochannels can be located here. There are several low and moderately high mounds with structural as well as non-structural evidences. Most of these mounds are presently occupied by modern habitational areas.

Excavation at sites and important findings

The site was first excavated by the Ashutosh Museum of Indian Art of Calcutta University under the directorship of K. G. Goswami from 1956-57 to 1961-62 and C. R. Roychoudhury from 1962-63 to 1967-68 with the additional supervision by D. P. Ghosh during the field season of 1964-65 (IAR 1956-57, pp. 29-30; 1957-58, pp.51-53; 1958-59, p.55; 1959-60, pp.50-52; 1960-61 pp.39-40). Excavations were conducted at five different localities - i) Berachampa, near the Itakhola locality, ii) Khana-Mihirer Dhipi, a 14 feet high mound northeast of Berachampa, iii) Itakhola paddy field, iv) Noongola, situated between Khana-MihirerDhipi and Itakhola, and v) Hadipur, a village outside the mud fortification area in the southern quarter of Chandraketugarh. On the basis of the finds, the excavators have divided the occupation of the area into seven Periods starting from Mauryan Period to Early Medieval Period.

This excavation also revealed an early medieval structural repertoire represented by a temple that might have had its origin in the later early historic phase of occupation at the site. A temple structure measuring 19.20 sq m (63 sq ft) with 4.26m (14 ft) projection on all the three sides to the east, west and south and a vestibule measuring 14.93 sq m (49 sq ft) attached to the main temple shows the major structural activity of the Gupta or post-Gupta periods. This has been explained as a North Indian temple of the *sarvatobhadra* type having *triratha* projections. The structure was repaired and renovated on later occasions using bricks of different size and some times decorative bricks were also used in place of ordinary ones.

Apart from the structures, some beautiful terracotta plaques and copper punch-marked coins have been recovered from

the excavated site. Some of the interesting finds include terracotta plaques containing couples or *mithunas*, terracotta female figurines with elaborate decorations, a terracotta plaque containing a pair of parrot pecking a lotus-pod, terracotta plaques containing animal and erotic human figures, a terracotta sealing with the design of a peacock sitting on a *toraṇa* and a bone awl, a terracotta sealing with the legend *sadada* in Middle Brāhmī, fragmentary terracotta chariot drawn by two headless animals (horses?) with their foreparts decorated and a small bronze image of a female deity with a mirror in her left hand and an indistinct animal indicated on the pedestal as her vehicle. According to R.K. Chattopadhyay, 'Chandraketugarh is the only early historic site in West Bengal that yielded a terracotta repertoire that is unparalled among the ones recorded so far in eastern India' (Chattopadhyay 2018 : 86).

Recent Excavation

Even though the site was excavated by the University of Calcutta, the ancient mound known as Khana-Mihirer Dhipi has been declared as monument/site of National Importance on 24.9.1963on the basis of the importance of the site. As this site is an important excavated site, Archaeological Survey of India Kolkata Circle took up conservation work to properly maintain the earlier exposed structures so that the locals can appreciate the rich heritage. During the conservation work, a brick structure was exposed at Khana-Mihirer Dhipi where earlier excavation was not carried out. Accordingly, this area was selected for excavation under the direction of the first author. The recent excavation came to a halt at a depth of 1.2 m where the brick walls have been exposed in the trench N10W30. South-facing brick wall which is running from east to west takes a turn at 5.9 m towards the south at both the ends. Six courses of brick wall have been exposed in Quadrant 4 and 25 courses in Quadrant 3. This massive wall has two projections, one after 15 courses and another after 6 courses of the first projection. The size of the bricks is 4-5 cm in thickness and 20-25 cm in length. The bricks are mainly reused. At the lower level of the wall, the size differs, 29 cm in length and 4-5 cm in thickness. The south-western portion of the structure which is connected with the main structure run up to 2.2 m and the south-eastern portion of the structure run up to 1.10 m. Both these structures are damaged and brick robbing is also noticed. Two parallel brick walls were also noticed in the northern part. These massive walls, which run from south to north, continue in unexcavated area of Quadrants 1 and 2 of this trench. This structure was originally constructed during the Gupta period as suggested by the details of brick sizes, though this structure was repaired as well as expanded during the post Gupta as well as early medieval period.

The exposed structure looks like a cell which is an extended part of the earlier excavated temple or a separate temple located within the same complex. The present excavation highlighted that this part of the mound was not excavated earlier. Further excavation of this area may expose the complete plan of the structure.

Different antiquities recovered during the excavation include a broken terracotta spindle whorl, sling ball and beads of terracotta, steatite and semiprecious stones like agate and jasper. An elongated ivory dice measuring 5.5×0.7 cm is another important discovery. A terracotta sealing was found during the excavation which depict pleasure scene of a couple.

During the course of excavation, we also found large numbers of potsherds of red ware, grey ware, black slip ware and black

Plate 1. Aerial view of exposed structure at Khana-Mihirer Dhipi, Chandraketugarh

Plate 2. Newly excavated Brick structure at Khana-Mihirer Dhipi

Plate 3. Excavated Antiquities from Khana-Mihirer Dhipi

ware. On the basis of the available potsherds, we can easily divide the cultural sequence of the area starting from Early Gupta, Gupta, Late Gupta and Early Medieval Period. Some handmade decorated storage jars were notice from the Early Gupta level. Further some important shapes are jar, *hā̃ḍi,* bowl, dish, basin etc.

The recent excavation at the site clearly shows that Khana-Mihirer Dhipi was not completely excavated as suggested by most of the scholars. There are some more hidden structural remains at the site which indicate that this North Indian *sarvatobhadra* type of temple has other contemporary shrines within the same compound and they might

Plate 4. Newly excavated pottery from Khana-Mihirer Dhipi

represent the largest early historic temple structural activities in Bengal. However, these structural activities were not studied properly. In course of our recent study, we have tried to draw on the earlier exposed structure as well as with the aid of aerial photography we attempted at a better understanding of the nature as well as the proper plan of this temple. Chandraketugarh is famous as an early historic port city and scholars also try to correlate this site with other port cities of ancient India, but they fail to view the site as an important religious site. The reconstruction of the proper plan of the *sarvatobhadra* temple and the accompanying brick structure, possibly forming part of a temple cell, exposed this year, certainly add to our knowledge of the site. Future excavation at the site may clear the concept of the structural activities at the site and its correlation with the other sites in and around Chandraketugarh.

References

1. Chattopadhyay. R. K. 2018. *The Archaeology of Coastal Bengal.* New Delhi: Oxford University Press.
2. *Indian Archaeology — A Review (IAR)*. Volumes cited in the Text.

সদ্যোত্তীর্ণ শতবর্ষে কথাশিল্পী বিমল কর

সুব্রত ঘোষ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ

প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ছবি ফিকে হতে না হতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা এই সমাজের বুকে তীব্র প্রতিক্রিয়ার ছাপ রেখে গেল। এই কালপর্বেই জাপানী হানা, আগস্ট আন্দোলন এবং মেদিনীপুরের বিধ্বংসী প্লাবন। এছাড়া এই সময়-চিহ্নকে দুঃসহ করে তুলেছিল পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং রক্তাক্ত ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। অবশেষে যে খণ্ডিত স্বাধীনতা অর্জিত হলো—তার জন্যও বোধহয় আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। হয়তো এ রকম স্বাধীনতা কাম্যই ছিল না আমাদের। ক্রমশ বদলে যেতে থাকল এই সমাজ এবং তার মুখগুলি; উন্মিলিত হল অসংখ্য মানুষ আর ছিন্নভিন্ন হতে থাকল তাদের আশা-ভরসা। ঠিক এরকম পটভূমিতে মধ্যবিত্তের বিপর্যয় ও নৈরাশ্যের দৃশ্যাবলি ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন বেশ কয়েকজন লেখক। তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ এমনকি বুদ্ধদেব বসুর মতো শিল্পী নন, অশংত তারাশঙ্কর, মুখ্যত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা প্রবল রূপে গণ্য হলো। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৭), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৭), সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০), বিমল কর (১৯২১), রমাপদ চৌধুরী (১৯২২), সমরেশ বসু (১৯২৪) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য স্রষ্টারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাঙালি সমাজকে চিহ্নিত করতে গিয়ে তার অবক্ষয়, বিচ্ছিন্নতা, অন্তঃসংকটের মতো প্রসঙ্গগুলির যথাযথ উপস্থাপনায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় রাখলেন। রোমান্টিকতার আবেশ কিংবা সমাজ-গঠনের কৌশল অপেক্ষা এইসব কথাশিল্পীদের কাছে প্রাধান্য লাভ করল ক্ষত-বিক্ষত মূল্যবোধের উপর জেগে থাকা অনেক উদ্যত জিজ্ঞাসা; তীব্র হয়ে উঠল ব্যক্তি-জীবনকে স্বতন্ত্র আঙ্গিকে উপস্থাপনার অদম্য তাগিদ।

বর্তমান কালের অন্যতম প্রধান কথাশিল্পী বিমল করের (১৯২১-২০০৩) কথাশিল্প বিশ্লেষণকালে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় শিল্পচেতনার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ---সংবেদনশীলতা ও মনস্তাত্ত্বিকতা। ঔপন্যাসিক বিমল কর মূলত অন্তর্লোকের ব্যাখ্যাতা। তাঁর কলমে ঘটনার ঘনঘটা বা ফেনায়িত আতিশয্য নেই বললেই চলে। স্রষ্টার ইঙ্গিতগূঢ় লেখনী চকিতে উদ্ভাসিত করে তোলে মানব-মানবীর 'হৃদয়তল'। সচেষ্ট হয় মানবিক সম্পর্কের 'গ্রন্থি' উন্মোচনে। তাঁর স্বাতন্ত্র্য আলোচনাকালে সমালোচক জানিয়েছেন, "সমকালীন লেখকদের মধ্যে জীবনদৃষ্টির প্রজ্ঞায়

ও শিল্পায়নের পরিণতিতে বিমল করের প্রতিভাই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। ঘটনা তাঁর উপন্যাসে অপ্রধান। ঘটনাবিরল কাহিনীর মধ্য দিয়ে লেখক বলে যান এমন এক জীবনের ইতিবৃত্ত যা পাঠকমনের অনেক তলদেশ দিয়ে বয়ে যায়।"[১] অসুস্থ জগৎ ও জীবনের চিত্রণ, অবচেতনের জটিল রহস্য আর প্রগাঢ় বিষাদ যেমন তাঁর শিল্প-উপাদানের অঙ্গীভূত, তেমনই উল্লেখনীয় প্রজ্ঞাদৃপ্ত দর্শননিষ্ঠ ভাবনার বিস্তার এবং ভালবাসা ও বিশ্বাসের শুশ্রূষা যা তাঁর মনোধর্মের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। বিমল করের সাহিত্যচেতনায় অস্তিত্ববাদী চিন্তার প্রকাশ দুর্লভ নয়। একইসঙ্গে অস্বীকারের উপায় নেই যে, পাঠকের অনুভবে তিনি পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন এমন এক ঠিকানার সন্ধান, যেখানে নৈরাশ্যের অন্ধকার ভেদ করে উত্তরণের আলোকতীর্থটি স্পষ্ট।

কথাসাহিত্যিক বিমল করের সাহিত্যভাবনায় অসুখের পৌনঃপুনিক উপমা বা মৃত্যুর ছায়াপাত কখনও-কখনও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে প্রকাশমুখ খুঁজে নিয়েছে ঠিকই, শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্তরটি ডিঙিয়ে তা ব্যাপ্তি লাভ করে সামগ্রিক জীবনবোধের আধারে। পর্যালোচনাকালে লক্ষ করা যায় ঔপন্যাসিক সৃষ্ট চরিত্রগুলি বাস্তবিকই কোনও শারীরিক অসুস্থতায় পীড়িত, কখনও আবার অনির্দেশ্য মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত। ক্ষেত্রবিশেষে কোনও দুঃখজনক পূর্বস্মৃতি একটা না ছোড় বোঝার মতো চরিত্রের ঘাড়ে চেপে থাকে বা অদৃশ্য ক্ষতের মতো সমগ্র সত্তাকে কুরে কুরে খায়। তাঁর কাহিনীবলয়ে আত্মিক অবসাদ ও নৈঃসঙ্গের শিকার বিভিন্ন চরিত্র যেমন ভিড় জমায়, তেমনই বেশ কিছু চরিত্রের মধ্যে মৃত্যুচিন্তামুখর-নিয়তিনির্ভর ভাবনারাশি প্রশ্নশীল করে তোলে পাঠকবর্গকে। বিশ্লেষণকালে এ-ভাবনা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে, শারীরিক এবং মানসিক এই অসুস্থতার মধ্য দিয়ে মানবিক সম্পর্কের বিচ্যুতি, নৈতিক পঙ্গুত্ব, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং আধুনিক সভ্যতার সংকটকে শিল্পমাধ্যমে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন উপন্যাসস্রষ্টা। স্নেহ-ভালবাসাহীন মমত্ববর্জিত মানুষের নৈঃসঙ্গ-অসহায়তা যে ক্যানসার বা লিউকোমিয়ার মতো ভয়ঙ্কর ব্যাধিতে আক্রান্ত নরনারীর চেয়ে কিছু কম নয়, সে বিচারে স্রষ্টা সংশয়হীন। এইসব ব্যাধির চিকিৎসা আপাতদৃষ্টিতে কেমোথেরাপি বা অন্য কিছুতে। কিন্তু মানবিক সম্পর্কের সংকট নিরসন শুধুমাত্র বাহ্যিক কোনও প্রক্রিয়ায় নয়, তা সম্ভব জীবনের প্রতি গাঢ় ভালবাসা, গভীর বিশ্বাস এবং আস্থাবোধেই—একথা শিল্পী বিমল করের উপন্যাসের পুনরাবৃত্ত প্রসঙ্গ।

অন্তর্বিশ্বের ব্যাখ্যাতা রূপেই বিমল কর মূলত পাঠকের কাছে স্বীকৃত এবং নন্দিত। অবশ্য অন্য দিকটির প্রতিও তিনি অমনোযোগী থাকেননি। ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ, আত্মঘাতী-অসুস্থ যুবসমাজের যে চিত্রায়ণ তিনি করেছেন, তাও আমাদের অভিনিবেশ দাবি করে। বিভ্রান্ত-বিপথগামী 'এই যুবকেরা' যে সর্বতোভাবে বিকৃত-পঙ্গু সমাজব্যবস্থার শিকার—সেকথা মনে করিয়ে দিতে দ্বিধা বোধ করেননি তিনি।

লক্ষণীয় শিল্পী তাঁর অনেক উপন্যাসেই মানবজীবনকে সংস্থাপন করতে চেয়েছেন প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে। মানবজীবন বা ব্যক্তিচরিত্র সেখানে উপমিত হয়েছে গাছের সঙ্গে, তার শিকড়ের সঙ্গে। বাইরে থেকে ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু শিকড় ছড়িয়ে যায় মাটির গভীরে। কে জানে—কতদূর তার বিস্তার! একইভাবে, যে জীবনটি বাইরে থেকে একরকম মনে হয়, অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়ায় তাই-ই হয়তো অন্যরকম। ঠিক শিকড়ের মতো। সহসা কারও চোখে পড়ে না। উপন্যাসকার চকিত উদ্ভাসনে তাঁর মরমী অনুভবে ছুঁয়ে যেতে চেয়েছেন এই অন্তর্ময়তা। ক্ষণপ্রভ জীবনের অস্তিত্ব বিমল করের মতো শিল্পীকে পৌঁছে দিতে চেয়েছে দার্শনিকতার পরম উপলব্ধিতে, গভীরতর বোধের নির্লিপ্তিতে। সংবেদনশীল অন্তর্গূঢ় শিল্পীর এই নির্লিপ্তিকে সন্ধান করা চলে তাঁর ভাবনার আশ্রয়েঃ "বারন্দার গায়ে নুড়ে পড়া সেই বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষের ডালপালাগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতাম, ধ্যুৎ মানব জন্মটাই অর্থহীন। পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মতন সুখের মুহূর্তগুলিও বড় ক্ষণস্থায়ী।"[২] জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের প্রতি এই

দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই শিল্পী হয়তো জীবনসত্যের সন্ধানে ব্যাকুল হয়েছেন। পূর্ণের স্বরূপ কী? অপূর্ণতায় বেদনা কীভাবে পরিহার করা সম্ভব—ইত্যাদি প্রশ্নের দার্শনিক সমীক্ষায় প্রবৃত্ত হতে চেয়েছেন। তীব্র জীবন-জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়েও আরোগ্যের বা উপশমের সম্ভাবনায় উন্মুখ থেকেছেন আজীবন।

বর্তমান সময়পর্বের বুকে দাঁড়িয়ে একথা অস্বীকারের নয় যে, এই যুগ উৎকণ্ঠার-যন্ত্রণার। অবিশ্বাস ও অসহিষ্ণুতার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার বোধ আর নৈঃসঙ্গের আর্তি অসহনীয় করে তুলেছে আমাদের জীবন-পাঁচালী। একদিকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা যখন হাট করে খুলে ফেলতে চাইছি বিপুল বিশ্বের দরজা-জানালাগুলো, তখন অতিমারির মারাত্মক ছোবল উৎকণ্ঠা অনিশ্চয়তার মধ্যে শোনাতে চাইছে মৃত্যুর পদধ্বনি। ব্যাধি যে শুধুমাত্র শরীরে থাবা বসিয়েছে হয়তো এমনটা নয়, অন্তর্জাত অসুখের চিহ্নগুলিও প্রকট হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় ভোগের অর্পযাপ্ত উপকরণ সত্ত্বেও একাকিত্বের অদ্ভুত বিপন্নতা ব্যক্তি মানুষটিকে গ্রাস করে ফেলছে। অনন্বয়ের কুয়াশায় আজ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সবকিছু; অদ্ভুত কোনও মূল্যবোধহীনতায় আক্রান্ত ব্যক্তি ও সমাজ।

২

ঠিক এই রকম পটভূমিকায় বিশেষভাবেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে জন্মশতবর্ষের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা বাংলা কথাসাহিত্যের অনন্য রূপকার বিমল করের সাহিত্যভাবনা। বর্তমান আলোচনায় এই কথাশিল্পীর মানসপ্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৃষ্টি-সামর্থ্যের উজ্জ্বল পরিচয়বাহী প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি উপন্যাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। যেমন সর্বাগ্রে উল্লেখ করা চলে তিন পর্বে সম্পূর্ণ বিশাল উপন্যাসে *দেওয়াল*-এর কথা। প্রথমটি *ছোটঘর* (১৩৬৩)। এ-পর্বের ঘটনাকাল ১৯৪১-এর মাঝামাঝি থেকে জুলাই ১৯৪২ পর্যন্ত। *ছোটমন* (১৩৬৪) উপন্যাসটির দ্বিতীয় পর্ব। ঘটনাকাল জুলাই ১৯৪২ থেকে ডিসেম্বর ১৯৪৩। তৃতীয় পর্বের নাম *খোলা জানলা* (১৩৬৯), ঘটনাকাল ১৯৪৪ থেকে জুন ১৯৪৫। তিন পর্বে সম্পূর্ণ উপন্যাস *দেওয়াল*-এর মধ্যে উপন্যাসকার সমকালীন সমাজের এক নিখুঁত বিবরণ তুলে ধরেছেন। আমাদের জানা বিমল করের মতো শিল্পী মানবমনের গভীরে ডুব দিয়ে জটিল রহস্যের সন্ধানে নিজেকে মগ্ন রাখতেই বেশি স্বচ্ছন্দ। বৃহৎ ক্যানভাসে দেশকাল প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি বিশেষ ভাবিত নন। এই গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসটি কিন্তু অন্য ধারণাকে প্রমাণ করে। উপন্যাসের মধ্যে তিনি গতায়ু শতকের ৩৯-৪৫ অর্থাৎ চতুর্থ দশকের এক তথ্য-সমৃদ্ধ দলিল পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন। সমাজজিজ্ঞাসার আশ্চর্য পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষিত হয়েছে চিরন্তন হৃদয়াকুতির উৎসারণ। একারণেই কেন্দ্রীয় চরিত্র সুধা শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতায় বিধ্বস্ত হয়েও সুচারুর হাতে নিজের শীর্ণ হাত তুলে দিতে চায়, সুচারুর বুকের মধ্যে ভালবাসার প্রতিধ্বনি শোনে। সুচারুও বুঝতে পারে অনেক কিছু হারিয়েও জীবনে এমন কিছু আছে, যাকে নিয়ে বেঁচে থাকা যায়। " 'ছোটঘর' আমাদের ক্লান্ত করে। 'ছোট মন' আমাদের সত্তাকে বিপন্ন করে তুলতে চায়। তবুও বাঁচার মায়াতে আমরা প্রাণিত হই। সেই মুহূর্তে *খোলা জানলা* দিয়ে মুক্তির আশ্বাস আছড়ে পড়ে ঘরের চার 'দেওয়াল'-এ। একইসঙ্গে নতুনভাবে বেঁচে ওঠে জীবনের নষ্ট স্বপ্নও।"[৩] 'খড়কুটো' (১৩৭০) উপন্যাসে যাবতীয় রুগ্নতা ও বিষাদ তুচ্ছ করে ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসের মধ্যেই ভ্রমর নিজেকে জাগ্রত রেখেছে আর সেটা সম্ভব হয়েছে অমলের নিবিড়-মধুর সাহচর্যে। ভ্রমরের দুখী জীবনের অমলের উপস্থিতি মুক্ত বাতাসের মতোই। ভ্রমর একান্তভাবে বিশ্বাস করেছে 'ভালোবাসাই আরোগ্য'। এর হদিশ এতদিন সে পায়নি। কঠিন অসুখ তার জীবনীশক্তিকে তিল-তিল করে ক্ষয় করে চলেছিল। কিন্তু ভালবাসা যে সব ব্যাধি দূর করে, সব কিছু ফিরিয়ে দেয়, এই বিশ্বাসে এখন সে পরিপূর্ণ। এ বিশ্বাসের পটভূমি জীবনানন্দ-কথিত 'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়'। *পূর্ণ অপূর্ণ* (১৩৭৪) উপন্যাস সম্বন্ধে স্বয়ং লেখকের ধারণা ছিল, "আমি

এই উপন্যাসটিকে আমার লেখালেখির মধ্যে সবচেয়ে নিজের বলে মনে করি। করি, কেননা এই লেখাটির মধ্যে আমার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তা, জীবন সম্পর্কে অ্যাটিটিউড এবং নিজের বক্তব্যটি বলতে চেষ্টা করেছি।"[৪] উপন্যাসে লক্ষ করা যায়, নশ্বর পৃথিবীতে ভালো-মন্দ নিয়ে যতই মাথা ঘামানো হোক না কেন—চূড়ান্ত বিচারে সবটাই অনিশ্চিত। পূর্ণের অভিমুখী সুরেশ্বর তাই অনেক প্রাপ্তিকে হেলাভরে পরিত্যাগ করেছে। ভয়ঙ্কর ব্যাধির কবল থেকে রেহাই পাওয়া হৈমন্তী সুরেশের জীবনের সঙ্গে নিজস্ব আত্মাকে মিশিয়ে দিতে চাইলেও প্রত্যাখ্যাত হতে হয়েছে তাকে। আসলে কর্মের ভিতর দিয়ে, সেবার ভিতর দিয়েই পূর্ণতার সন্ধানে মগ্ন হয়েছে সুরেশ্বর। যা কিছু পরম তাই যে গ্রহণযোগ্য—এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই লেখক শুরুর শুরুতে উপনিষদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ "যান্যনবদ্যানি কর্মানি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরানি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি।।" ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ যুব সমাজের আত্মধ্বংসী কার্যকলাপের পটভূমে রচিত *যদুবংশ* (১৯৬৮) উপন্যাসটি স্রষ্টার তীক্ষ্ণ সমাজসচেতনার নিদর্শন। বিপথগামী যুবগোষ্ঠীর চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক শুধু তাদের দ্রোহ-বিক্ষোভকে প্রাধান্য দেননি, অনুভব করার চেষ্টা করেছেন তাদের বেদনার অংশটুকুও। 'যদুবংশ'---এই নামকরণ একান্তই রূপকাশ্রয়ী। যদুবংশজদের মতো এই সমাজের নবী নায়কেরাও নিজেদের ছিন্নভিন্ন করেছে, রক্তাক্ত হয়েছে। অধঃপতিত যদুবংশের করুণ পরিণতি অসহায়ের মতন কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল। এমনিভাবে গণাদা বা গণনাথকেও। নিজের জীবনের বিনিময়ে সে সূর্য-বুল্লি-অভয়-কৃপাময়দের নাড়া দিয়ে গেছে। 'অসময়' (১৩৭৯) উপন্যাস জীবন-সমীক্ষার এমন এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, যেখানে অসহায়তার নিগড়ে আবদ্ধ মোহিনীর আর্তি-দোলাচলতাকে স্রষ্টা পৌঁছে দিয়েছেন পাঠকের কাছে। রাজেশ্বরী হবার কথা থাকলেও রিক্ত হৃদয়ে তাকে স্বামীগৃহ থেকে ফিরে আসতে হল। সময়-অসময়ের দ্বন্দ্বে মথিত মোহিনীর জীবনে অবিন নামের এমন এক তরুণের আবির্ভাব, যে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে মোহিনীর ঘুম ভাঙাতে সচেষ্ট। কিন্তু এই অসময়ে মোহিনী কীভাবে তাকে গ্রহণ করতে পারে! সত্যিই কি তার জীবনের 'সর্বনেশে পুরুষকে' ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব? সমালোচকের পর্যবেক্ষণে আস্থা রাখা চলে, "সব মিলিয়ে বহুদিনের অভ্যস্ত পরিবেশে তার এই ধাক্কাকে সে কিছুতেই আমল দিতে চায় না, অথচ তার ভিত নড়ে গেছে প্রথাভাঙা এক গভীর জটিল সম্পর্কের টানে।"[৫] সমস্যা-সংকটে বিধ্বস্ত সময় এবং আঘাতে-উৎকণ্ঠায় বিপর্যস্ত মানুষের ছবি 'কালের নায়ক' (১ম পর্ব ১৩৮৩, ২য় পর্ব ১৩৮৮) উপন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠেছে। বড়ভাই রথীনের লোভ-স্বার্থপরতায় একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের কাঠামো হুড়মুড় করে কীভাবে ভেঙে পড়ল—তার বিবরণ নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। ছোটভাই সতীন এ উপন্যাসে 'কালের নায়ক' হিসাবে গণ্য হতে পারে। তার যন্ত্রণা ও প্রতিবাদ পাঠকের মনে নাড়া দিয়ে যায়। মধ্যবিত্ত পরিবারের এই ফাটল, মানবিক সম্পর্কের অধঃপতন প্রসঙ্গে সমালোচক সঠিকভাবে জানিয়েছেন, "আমাদের চেনাকাল ও পরিবেশ এখানে এত নিকটবর্তী ও স্পষ্ট যে আমরা তাকে ছুঁতে পারি। মধ্যবিত্তের অবলম্বনহীনতা, নিঃসঙ্গতা ও অসহায়তার চেতনাকে নির্মোহ দৃষ্টিতে উপস্থাপিত করেছেন লেখক।"[৬] লেখকের হ্রস্বাকৃতির উপন্যাস নিরস্ত্র (১৯৮২)। কাহিনীতে স্পষ্ট-অস্ত্রহীন ব্যক্তি প্রকৃতই অসহায়, বিশেষত প্রতিপক্ষ যদি সশস্ত্র ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। কিন্তু একটা সময় আসে যখন পিছনে হঠতে-হঠতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে, সময় আসে পাল্টা আঘাত হানার। এ কাহিনীতে দেখা গেল সেই ছবি—নিরস্ত্রের মরণপণ লড়াই, মার খেতে-খেতে মরিয়া হয়ে ওঠা। উপন্যাসের নায়ক বোধন মাটিতে লুটিয়ে পড়েও প্রতিবাদের নিশাল তুলে ধরে, প্রতিরোধের ভাষ্য রচনা করে যায়। 'হৃদয়তল' (১৯৮৭) উপন্যাসে উপন্যাসকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রৌঢ় গৃহকর্তা রজনীকান্তের উপলব্ধিতে প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে—"সুখ শান্তি ইট কাঠ দরজা জানালার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে না। থাকে মানুষকে জড়িয়ে।" *গ্রন্থি*

(১৯৮৮) উপন্যাসে রূপ পেয়েছে অন্তঃসংকটের মর্মস্পর্শী বিবরণ। একদা 'ছোটতারা' রূপে পরিচিত অভিনেত্রী বিজলীর অসুস্থতা—ক্যানসার বাস্তবিকই অসুখ; আবার মানিক দত্ত, নববাবু ও সন্তান কুমারের সঙ্গে সাম্পর্কিক জটিলতা এবং অভিনেত্রী জীবনের হতাশাজনিত অ-সুখেরও প্রতীক। শেষ পর্যন্ত অন্ধকারে বিলীয়মান মা ও ছেলের সম্পর্কের পুনরুজ্জীবন ঘটে ঠিক, তখন অবশ্য অনেক দেরি হয়ে গেছে। বিদায়ের মুহূর্তে অপরিমেয় যন্ত্রণাতে পিষ্ট হতে হতে কুমারের মনে হচ্ছিল, "মায়ের এই মৃত্যু তার বেদনা যেন আমাদের মধ্যেকার অন্ধকারে থাকা, আড়ালে থাকা জটিল সম্পর্ক স্পষ্ট করে দিয়ে গেল। বোধহয় কোন সত্যকে।"

৩

উপন্যাসশিল্পী বিমল করের সৃষ্টিকলা বিষয়ে আলোচনাকালে আমরা লক্ষ করি "মানুষের বা ব্যক্তির জন্মলব্ধ স্বাধীনতাকে ও স্বাধীনতার দায়কে বিমল কর অনুভব করেন। তাঁর উপন্যাসে সেই আধুনিক অস্তিত্বগত যন্ত্রণার দেখা পাই।"[৭] এই দায় বহন করতে গিয়েই শিল্পী অন্ধকারের পাশাপাশি আলোর উদ্ভাস ফুটিয়ে তুলতে দ্বিধা করেন না। 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'[৮] তথাপি 'অনন্ত সূর্যোদয়'[৯] প্রত্যক্ষ করার আকাঙ্ক্ষা থেকে কোনওভাবেই বিচ্যুত থাকতে রাজি নয় শিল্পী-মানস। স্রষ্টার মুখ থেকে শোনা গেছে, "অসুস্থতা-ব্যাধি-মৃত্যু আমার সাহিত্যে বারবার এসেছে। তবে মনে রাখতে হবে অন্ধকার বা ঝড়ের মধ্যেই সবকিছু শেষ হবার নয়। গ্রহণেই যে বাঁচা সম্ভব—বর্জনে নয়; তা আমার একান্ত ধারণা। ভালবাসাই আরোগ্য—এই বোধের আলো আমার সাহিত্যে যথাসাধ্য প্রতিফলনের চেষ্টা করেছি।"[১০] প্রকৃতপক্ষে কথাশিল্পী বিমল কর তাঁর গভীর ও ব্যাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তি কিংবা সমাজের যন্ত্রণা-বিপন্নতার ছায়াপাতকে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করতে অসম্মত থেকেছেন। শিল্পীর দায়বদ্ধতা শুধু সমস্যা উত্থাপনে শেষ হয় না। এই বিশ্বাসে অটুট থেকে তিনি সমাধানের আশ্বাসও যুগিয়ে গেছেন। "বিমল কর শব্দবন্ধের যা বাচ্যার্থ, ব্যঞ্জনার্থে সেটাই তাঁর লেখক পরিচয়।"[১১] এ মন্তব্য-নির্যাসে স্পষ্ট হয়ে যায় জন্মশতবর্ষের সন্ধিলগ্নে দাঁড়ানো শিল্পীর মানস-বৈশিষ্ট্য, তাঁর স্বাতন্ত্র্য। পরিশেষে আলোচনার ইতি টানব এই অনন্য সৃজনশীল ভূয়োদর্শী সাহিত্যিকের গভীর চেতনাবাহী ভাষ্যকে উপস্থাপিত করে : "এই জগৎ যে সর্বাংশে মধুর নয়। প্রকৃতিও সর্বত্র সদয় নয়; মানুষের ইতিহাসও কলঙ্কহীন নয়। বর্বরতা, নৃশংসতা, রক্তক্ষয়, শঙ্কা, শোকদুঃখ—সবই আছে এখানে। তবু, যে অলস মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে মানুষ ছোট ছোট সুন্দর দৃশ্যগুলি দেখে জগতের—আকাশ পাখি ফলমূল শুধু নয়, আমাদের জীবনের দৈনন্দিনের সুন্দর ছবিগুলি—সেগুলিই তো আমাদের সম্বল। বেঁচে থাকার আনন্দ।"[১২]

উল্লেখপঞ্জি :

১ কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, 'বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ', ১৯৮৯, পৃ. ৬১
২ বিমল কর, 'উড়োখই' ১ম পর্ব, ১৯৯২, পৃ. ২১৯
৩ সুব্রত ঘোষ, 'বিমল করের উপন্যাস : প্রসঙ্গ অসুখের উপমা', ২০০৬, পৃ. ৬১
৪ বিমল কর, 'উড়োখই', ২য় পর্ব, ১৯৯৪, পৃ. ১৩৯
৫ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, 'অসময় : সময় অসময়ের দ্বন্দ্ব', তীব্র কুঠার, ২০০৩, পৃ. ৮৯
৬ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের প্রতিমা', ১৯৭৪, পৃ. ২৯৪
৭ সরোজ মুখোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, ১৯৮৮, পৃ. ৪০০
৮ জীবনানন্দ দাশ, 'সুচেতনা' ঃ বনলতা সেন, ১৩৯৬, পৃ. ৪৪
৯ তদেব, পৃ. ৪৫
১০ সুব্রত ঘোষ, তদেব, পৃ. ১৯৯
১১ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা: ১৮.১০.৯২
১২ বিমল কর, 'উড়োখই' ২য় পর্ব, ১৯৯৪, পৃ. ২৫১

বিমল কর এবং তৎকালীন যুবসমাজ

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
কথাসাহিত্যিক

"ওরা রাস্তার মধ্যিখানে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। সাইকেলগুলো কোমরের কাছে হেলানো। কাছাকাছি কোথাও আলো নেই।

ফাঁকা সরু গলির মধ্যে এলোমেলো বাতাস রয়েছে বর্ষার। আকাশে ছোটে ছোটো মেঘ ভেসে যাচ্ছিল বলে চাঁদের আলো কখনও ফুটছে, কখনও নিবছে, যেন গলির মাথার উপর দিয়ে জ্যোৎস্নার বাতি হাতে ঝুলিয়ে কেউ যাওয়া-আসা করছে।"

যদুবংশ-এর শুরুটা এভাবেই। ওরা মানে, ওরা চারজন। সূর্য, বুললি, কৃপাময় আর অভয়। বিমল কর যখন এই উপন্যাস লেখেন, ১৯৬৭ সাল। কংগ্রেস সরকার চলে গিয়ে ক্ষমতায় প্রথম যুক্তফ্রন্ট। বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন দ্বন্দ্বের তুঙ্গে। নকশাল আন্দোলন তখনও আঁতুড়ঘরে। *যদুবংশ* উপন্যাসের চার চরিত্র নিয়ে যে উপন্যাসটি লিখলেন, পাঠকের মনে হতেই পারে কোন একটা ভাঙচুরের আন্দোলন দানা বাঁধছে গোকুলে।

চার মূর্তিই আকাট বেকার, চাকরি পাবে এমন সম্ভাবনা সাতাশ কেন সাতশো মাইলের মধ্যে নেই, তাদের বাবারা কেউ ভালো চাকরি করেন, কেউ সংসার চালান কায়ক্লেশে, কিন্তু চারজনের কেউই হাতখরচ পর্যন্ত পায় না। অথচ চারজনই সিগারেটে অভ্যস্ত, সুযোগ পেলেই বসে পড়ে মদের বোতল নিয়ে। চার চরিত্রের মধ্যে মুখ্য চরিত্র সূর্য, তার বাড়ি থেকে একটি মূল্যবান বস্তু চুরি করে দিয়েছিল গণনাথ নামে এক মধ্যবয়স্ক দরিদ্র ব্যবসায়ীকে। তার বিনিময়ে সূর্য কখনও পাঁচ টাকা কখনও দশ টাকা নিয়ে ফূর্তি করত বন্ধুদের সঙ্গে।

এই বখে-যাওয়া প্রজন্মকে সকলেই দেখেছেন সেসময়। কিন্তু সেই প্রজন্মকে নিয়ে উপন্যাস লিখে বিমল কর দেখিয়েছেন কী ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল এই নষ্ট হয়ে যাওয়া যুবকেরা! তাদের কেউ পনেরো বছরের বড়ো দিদিকে 'মাগী' বলে গাল দেয়, কেউ বউদিকে 'শালা বেজন্মার বংশ' বলে হেনস্থা করে, কেউ পাড়ার প্রভাবশালীর বাড়িতে চাকরি চাইতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তাঁর দেওয়া চায়ের কাপ মাটিতে ফেলে ভাঙে, কেউ পাড়ার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খায়, কেউ তাদের চেয়ে কিছু বেশি বয়সের একজন মানুষকে সামান্য কয়েকটা পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে 'শয়তান, চোর চোট্টা হারামী কাহাকার' বলে লাথি মারে। এই উপন্যাসেই আবার দুই যুবতীর মধ্যে লেসবিয়ন সম্পর্ক স্পষ্ট করেন লেখক।

যদুবংশ পড়তে গিয়ে আমরা ভেবেছি এই বিমল করকে আমরা চিনি না। তাঁর পাঠকদের খুব আশ্চর্য লেগেছিল *যদুবংশ* পড়তে গিয়ে। যে-লেখক *পূর্ণ-অপূর্ণ* লেখেন, *খড়কুটো* বা *বালিকাবধূ* লেখেন, তিনি কী করে *যদুবংশ* লিখেছেন এ-নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক।

এতদিন পরে, লেখকের শতবর্ষে *যদুবংশ* পড়তে গিয়ে আবিষ্কার করলাম বিমল কর ছিলেন একজন অনন্য দূরদ্রষ্টা। রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন সমকালীন যুবকদের হতাশা, ক্ষোভ, ক্রোধ যা পরে বিস্ফোরণ ঘটাবে বাংলার একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। বিমল কর সমকালীন সমাজের ধস নামা দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আতস

কাচে। বেকারত্বের শেষ সীমানায় পৌঁছে চার মূর্তি যেভাবে ধ্বংসাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে তা নকশাল আন্দোলনের আগের মুহূর্ত।

সেই আন্দোলন নকশাল আন্দোলন কি না তা বিমল কর হয়তো আঁচ করতে পারেননি, কেউই পারেননি হয়তো। কিন্তু 'দিওয়ার'-এর অমিতাভ বচ্চনের মতো বিমল কর চার অ্যাংরি ইয়ং ম্যানের যে-ছবি এঁকেছিলেন, তাতে এখন বুঝতে পারি, এই চার চরিত্রই আর কিছুকাল পরে হয়ে উঠবে মূর্তি-ভাঙার অগ্রণী চরিত্র। মূর্তি ভাঙার পর তারা মাসে একটি করে কনস্টেবল মারবে, তিন মাসে একটি করে সাব-ইনস্পেক্টর, নিয়ম করে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে গ্রামের জমিদার বা জোতদারদের।

সূর্য, বুললি, কৃপাময়, অভয়দের দিনযাপন পড়তে গিয়ে বারবার চমকে ওঠেন পাঠক, শিউরে ওঠেন তাদের ধ্বংসাত্মক আচরণে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি বেশ কয়েকটি উপন্যাসে যুবসমাজের এই ধ্বংসাত্মক রূপ পেয়েছিলেন পাঠক, তার মধ্যে একটি সমরেশ বসুর *বিবর*, একটি রমাপদ চৌধুরীর *এখনই*, অন্যটি বিমল করের *যদুবংশ*। কিন্তু *যদুবংশ* এখন পড়ে উপলব্ধি করলাম তৎকালীন সমাজকে কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পড়তে পেরেছিলেন বিমল কর।

তবে *যদুবংশ*-এর চার চরিত্রই তো সমকালীন যুবসমাজের একমাত্র প্রতিভূ নয়। বিমল করের আত্মজীবনীমূলক লেখা *উড়ো খই* এর এক জায়গায় লিখেছেন, "আমাদের জীবনের প্রতি পর্বের এক এক রকম চরিত্র থাকে। এ যেন একটি দিনের মতন। ভোরের ফরসা, সকালের নরম আলো, বেলার দিকের রোদের গাঢ়তা---এক এক রং ছড়িয়ে যায়। মধ্যাহ্নবেলার তাত, অপরাহ্নের মরে আসা আলো—তার বর্ণও আলাদা। তবু সব মিলেমিশে একটি দিনের সারাবেলা গড়ে ওঠে। আমাদের জীবনও যেন সেই রকম।"

ঠিক এই কারণেই যুবসমাজের অন্যদিকগুলোও ধরা পড়েছে তাঁর লেখায়। যুবসমাজের একজন প্রতিনিধি কি *খড়কুটো*-র অমল নয়? সবাই তো আর সূর্য কিংবা বুললি নয়, অমলের মতো আদ্যন্ত প্রেমিকও তো আছে, সে নিবিড়ভাবে ভালোবাসে ভ্রমরকে। ভ্রমরের মধ্যে অমল দেখতে পায় এক অনন্ত প্রেমের আধার যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে এই পৃথিবীতে। চারপাশের হতাশার মধ্যে প্রেমই তো অ্যান্টিবায়োটিক যার কারণে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে বেঁচে থাকা। সূর্য, বুললিরা কোথাও একটুকরো প্রেম খুঁজে পায়নি, ভালোবাসাও পায়নি একচিলতে, পেয়েছিল মদের বোতল।

কিন্তু অমলকে বাঁচিয়ে রেখেছিল প্রেম। দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করতে ভ্রমর চলে যাচ্ছে অনেক দূরের গন্তব্যে, অমল উপলব্ধি করছে হয়তো সে আর কোনও দিনই ফিরবে না, তবু অমল বিড়বিড় করে বলছে, "আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব, ভ্রমর।" সেই প্রেম স্নিগ্ধ, সুন্দর, প্রায়-নিঃশব্দ, ছুঁয়ে যায় প্রেমিকার সঙ্গে পাঠককেও।

অথবা এক যুবক-যুবতীর হানিমুনে যাওয়ার গল্প 'সুখ'। কোনও এক নববিবাহিত দম্পতি শুধু ঠিকঠাক থাকার ঘরের অভাবে তাদের দাম্পত্য জীবন উপভোগ করতে পারে না। হানিমুনে যাবে-যাবে করেও সুযোগ হয়নি, অবশেষে কলকাতার কাছেও নয়, দূরেও নয়, এমন একটি বাংলোবাড়ি ঠিক করে তারা দুজনে চলে এল মধুচন্দ্রিমায়। যথেষ্ট নির্জন, খোলামেলা পরিবেশে ঘর পেয়ে খুশিই হল দুজনে, কিন্তু পরের দিনেই তারা জেনে গেল আর এক বৃদ্ধদম্পতি পাশের ঘরে আছেন তাদের নির্জনতার পরিবেশ দূষিত করতে।

খুবই মুষড়ে পড়ল দুজনে যদিও ভদ্রতার খাতিরে তারা আলাপ করল বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সঙ্গে। অল্প আলাপেই তারা আবিষ্কার করল জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এলেও তাদের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা এখনও অটুট, বরং আগের চেয়ে আরও বেশিই কেননা দুজন দুজনের উপর এতটাই নির্ভরশীল যে, কোনও একজন ভাবতে পারেন না যদি একজন কেউ চলে যান, অন্যজন বাঁচবেন কীভাবে।

জীবনের সম্পূর্ণ অন্য এক দিক আবিষ্কৃত হল এই যুবক-যুবতীর সামনে।

গল্পটি খুব হালকা মেজাজে শুরু হয়ে শেষপর্বে পৌঁছে নবদম্পতির সঙ্গে পাঠকও আবিষ্কার করবেন জীবনের সারসত্য।

'জননী' গল্পেও মায়ের মৃত্যুর পর সন্তানরা মায়ের জীবনের অপূর্ণতার দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করে, মা বেঁচে থাকতে যে-কথা ভাবেনি, সেই কথাগুলোই উঠে আসে তাদের আলোচনার মধ্যে, যখন ইচ্ছে হয় মায়ের অপূর্ণ ইচ্ছেগুলো নিজেদের সাধ্যের মধ্যে, নিজেদের বোধের মধ্যে যতটা সম্ভব তারা চেষ্টা করবে পূর্ণ করতে।

লেখক হিসেবে বিমল করের খ্যাতি অবিসংবাদিত। ষাটের দশকের মাঝামাঝি তাঁর দুটি ছোটো উপন্যাস 'খড়কুটো' ও 'বালিকা বধূ' *দেশ* পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত ও পরে চলচ্চিত্রায়িত হওয়ার পর বিমল করের সাহিত্যবিশ্ব প্রসারিত হয় পাঠকদের সঙ্গে দর্শকদের ভিতরেও। আমাদের দেশে লেখকদের খ্যাতি অনেকটা নির্ভর করে তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাস সিনেমা হল কি হল না!

আমরা যারা তরুণ বয়সে গল্প লেখার চেষ্টা করছিলাম, তাদের কাছে বিমল কর ছিলেন অন্যতম আইকন। চল্লিশের দশকের লেখকরা তখন পত্রপত্রিকা আলো করে থাকেন। আমরা তাঁদের লেখা চোখে পড়লেই মনোনিবেশ করতাম আর বুঝতে চাইতাম ছোটোগল্প লেখার মুন্সিয়ানা কার কেমন! কোন লেখা পাঠকের কাছে বেশি পৌঁছোচ্ছে।

খুব ছোটো বয়সে বিমল করের একটি উপন্যাস পড়েছিলাম 'দেওয়াল'। সম্ভবত এই উপন্যাসেই তিনি নজর কাড়েন বোদ্ধা পাঠকের। তারও আগে ১৯৫২ সালে *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্প 'বরফ সাহেবের মেয়ে'। তারও কিছুকাল পরে লিখলেন 'আত্মজা'। এই গল্পটি লেখার পরে পাঠক-সমালোচক মহলে কিছু কানাকানি হয়েছিল গল্পটির বিষয় নিয়ে। তারপর একের পর এক ছোটোগল্প লিখে গেছেন, পাশাপাশি অসংখ্য উপন্যাস। তাঁর জীবন-আলেখ্য এক ধারাবাহিক সাহিত্যচর্চার বাস্তব নিদর্শন।

যুবসমাজ নিয়ে বলতে গিয়ে তাঁর কণ্ঠে শুনেছি আক্ষেপ। 'কেন লিখি' বলতে গিয়ে বলেছিলেন, "শুধুমাত্র কাল ও সময় নয়, যে সমাজ মানুষজন---তাঁদের বোধবিচার, ধ্যান-ধারণা, ভালোমন্দ আমি দেখেছি, — সেই মানুষগুলিকে আর দেখতে পাই না। বোধহয় 'লস্ট জেনারেশন' বলতে যা বোঝায় তাই। এঁদের জন্য আমরা একটা আক্ষেপ রয়েছে। কেমন করে তা মুছে ফেলব! অথচ এটা তো ঠিকই যে অতীত সূর্যাস্ত নয় যে আজ যা অস্ত গিয়েছে কাল সকালে তা উদয় হবে। অতীত আর ফিরে আসে না। বর্তমানের মধ্যে আমি বেঁচে আছি, কাজেই তা অবহেলা করার কথাই ওঠে না। লেখার মধ্যে ওটা তো থাকবেই।"

আমরা যারা পরবর্তী প্রজন্মের লেখক, তাঁদের কাছে বিমল করের সাহিত্যচর্চা অবশ্যই অনুকরণীয়। জীবনের এক-একটি খণ্ডাংশ থেকে কী করে গল্প খুঁজে নিতে হয়, কীভাবে তৈরি করতে হয় গল্পের শরীর, কীভাবে সাধারণ সংলাপও শুধু প্রয়োগের গুণে হয়ে ওঠে তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী, গল্প শেষ হওয়ার মুহূর্তে খুব হালকা চালের গল্পও কোন জাদুবলে মন ছুঁয়ে যায় পাঠকের।

একজন লেখক তাঁর জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা ও অনুভব উজাড় করে দেন তাঁর লেখায়। একজন লেখক কেন লেখেন এ প্রশ্নের উত্তরে এক-একজন লেখক তাঁর মতো করে উত্তর দেন। বিমল কর বলেছিলেন, "রসতত্ত্ব মান্য করলে বলতে হবে, সবরকম সৃষ্টির মূলে রয়েছে আনন্দ। আত্মতৃপ্তি। কথাটা অস্বীকার করা মুশকিল।"

একেবারেই সোজাসাপ্টা উত্তর। বিমল কর এও বলেছিলেন, "আমি সবসময় বিশ্বাস করেছি, এই জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে যাঁর যেমন ধারণা জন্মে সেটা প্রকাশ করার চেষ্টাতেই লেখক কলম ধরেন। তাঁর এই ধারণার কোথায় কতটুকু সত্য কোথায় ভুল—সে বিবেচনা অন্যে করতে পারেন, লেখকের তাতে হাত নেই।" তাঁর একজন অনুজ লেখক হিসেবে তাঁর এই ধারণা হৃদয়ঙ্গম করেছি, আমার মনে হয়েছে প্রত্যেক মানুষের ধ্যানধারণায় বিবর্তন ঘটে যত তিনি বয়সের সিঁড়ি একে-একে পার হতে

থাকেন। অল্প বয়সের ধারণার পরিধি কালক্রমে বদলে যেতে পারে আমূল। যে-যুবক অল্প বয়সে সমাজটা বদলে দিতে চেয়েছিল, সে-ই বয়সের ধাপ পার হয়ে উপলব্ধি করে প্রথম বয়সের ধারণা একেবারেই ভুল ছিল।

শুধু কি গল্পের যুবসমাজকেই তিনি এঁকেছিলেন তাঁর লেখায়! তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের লেখককুলকেও তিনি প্রশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গ দিয়ে, তাঁদের গল্প ছেপে। তাঁর একটি আত্মজীবনীমূলক লেখা 'আমি ও আমার তরুণ বন্ধুরা'য় তিনি সবিস্তার লিখেছেন পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে তাঁর সখ্যের কথা।

শেষ করার আগে আমার ব্যক্তিগত এক অভিজ্ঞতা না-বললে পরবর্তী প্রজন্মের লেখকদের প্রতি তাঁর প্রশ্রয় কতটা ছিল তা জানা যাবে না। বিমল কর *দেশ* পত্রিকায় সহ সম্পাদক হিসেবে ছিলেন ১৯৮২ পর্যন্ত। অবসর নেওয়ার পর *গল্পপত্র* নামে একটি লিটিল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করতেন যাতে শুধু গল্পই ছাপা হত। বেশ কিছু বছর পরে *দেশ* পত্রিকার তরফ থেকে আবার বিমল করকে গল্প নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দায়িত্ব পাওয়ার পর বিমলদা আমাকে ফোন করে গল্প দিতে বলেন। সেই গল্প ছাপা হওয়ার চার-পাঁচ মাস পর আবার ফোন। পর পর তিনটি গল্প ছাপার পর চতুর্থ গল্প পাঠিয়েছি, তার তিন দিন পর আমাকে ফোন করলেন বিমলদা, "তপন তুমি আবার স্কুলে ভর্তি হও।" আমি হকচকিয়ে ভাবছি, কী হল হঠাৎ! বললেন, তোমার ষোলো পৃষ্ঠার গল্প পড়তে আমার তিনদিন সময় লাগল। এ কী হাতের লেখা করেছ।

একসময় আমার হাতের লেখা স্পষ্ট ও পাঠযোগ্য ছিল। তারপর এত গল্প-উপন্যাস লিখতে হচ্ছিল, তা আর প্রেসকপি করে পাঠানোর সময় হয় না, ফলে প্রথমবার লেখার পর সেই পাণ্ডুলিপিতেই কাঁটাছেঁড়া করে পাঠাই। অন্য পত্রিকার সম্পাদকগণ ক্ষমাঘেন্না করে ছাপছিলেন, কিন্তু বিমলদার তখন বয়স হয়েছে, তাঁর পক্ষে আমার লেখা উদ্ধার করাই কঠিন। বললেন, এবারের মতো প্রেসে পাঠালাম, পরের বার ভালো করে লিখে পাঠাবে।

বেশ অপমান-অপমান লাগল, সেদিনই ঠিক করলাম আর হাতে লিখে নয়, কম্পিউটারে তালিম নেব। সরকার তখন পঞ্চাশ হাজার টাকা লোন দিচ্ছিলেন কম্পিউটার কেনার জন্য। সেই টাকায় কম্পিউটার কিনে শুরু করলাম ঝকঝকে পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে। পরের গল্প কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট নিয়ে পাঠাতে আবার বিমলদার ফোন, বললেন, তা হলে বকাবকি করারও সুফল আছে, কী বলো?

তারপর গত বাইশ বছরে কম্পিউটারে লেখা। আমি তো রক্ষা পেলাম, সম্পাদক-কম্পোজিটাররাও তথৈবচ। এ বছর তাঁর শতবর্ষ, এই লেখার মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পেয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃপক্ষকে।

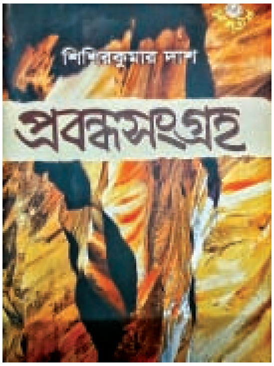

প্রবন্ধসংগ্রহ
শিশিরকুমার দাশ,
দে'জ পাবলিশিং,
কলকাতা, এপ্রিল,
২০২২, দাম: ৭৫০ টাকা
ISBN :
978-93-94079-55-7

অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশের অগ্রন্থিত প্রবন্ধের একটি সংকলন সম্প্রতি (এপ্রিল, ২০২২) কলকাতার দে'জ পাবলিশিং প্রকাশ করেছে। এই *প্রবন্ধসংগ্রহ*-র ক্ষেত্রে কোনো সম্পাদক/সংকলকের নাম উল্লেখ করা হয়নি। 'প্রকাশকের নিবেদন' অংশে এ-ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু জানানো না হলেও, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক দাশের আকস্মিক অকাল প্রয়াণের পর এই সংকলনের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিতে অধ্যাপক স্বপন মজুমদারের 'স্বতঃপ্রণোদিত' ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর অধ্যাপক মজুমদারের অসুস্থতা এই *প্রবন্ধসংগ্রহ*-র প্রকাশে দীর্ঘ বিলম্বের সঙ্গত কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। অবশেষে শিশিরকুমার দাশের অজ্ঞাতনামা 'বন্ধুদের' সাহায্যে ও সুস্মিতা দাশের সহায়তায় বইটি প্রকাশের আলো দেখেছে বলে প্রকাশকের তরফে জানানো হয়েছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের খ্যাতিমান উজ্জ্বল ছাত্র শিশিরকুমার দাশের কর্মজীবনের প্রায় পুরোটা সময় কেটেছে বাংলার বাইরে। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যচর্চা বিভাগ স্থাপিত হলে অধ্যাপক দাশ প্রায় সূচনালগ্ন থেকেই ঐ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যচর্চার তাত্ত্বিক পরিসর ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সাহিত্য আকাদেমি প্রকাশিত তিন খণ্ডে *ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস* তাঁর বিপুল পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অপরিমেয় মেধার পরিচয় বহন করে। দেশে-বিদেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরেজি রচনার সংকলন ও সম্পাদনা করে তিনি রবীন্দ্র-চর্চার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। প্রাচীন গ্রিক নাট্যসাহিত্যের অনুবাদ এবং অ্যারিস্টটলের 'কাব্যতত্ত্ব' সহ অন্যান্য তত্ত্বগ্রন্থের অনুবাদও তাঁর কাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ এক দিক। আবার মৌলিক নাটককার, কবি, এমনকি শিশু-সাহিত্যিক হিসাবেও বাঙালি সাহিত্যরসিকদের কাছে নিতান্ত অপরিচিত নন তিন। কিন্তু একথা সকলেই মানবেন যে, প্রধানত উনিশ-বিশ শতকের 'বাংলা' দেশ ও বাংলা সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ, তুলনামূলক ধর্ম-দর্শন ও ভাষাচিন্তা বিষয়ক বিচিত্র প্রবন্ধগুলি তাঁর চিন্তার গভীরতা ও পঠনের বিস্তৃতি ও বৈদগ্ধ্য-বিচ্ছুরিত যুক্তিশাসিত বাক বিন্যাসের অনায়াস দক্ষতাকে প্রকাশ করে।

এই সংগ্রহে মোট ৩৪টি প্রবন্ধকে সংখ্যা চিহ্নিত পাঁচটি গুচ্ছে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম বর্গে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিষয়ক পাঁচটি প্রবন্ধ রাখা হয়েছে। 'রামমোহন ও খ্রিষ্টধর্ম' শিরোনামাঙ্কিত প্রথম রচনাটিতে যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী রামমোহনের ধর্মচেতনার স্বরূপটি প্রধানত তাঁর 'The Precepts of Jesus/The Quide to Peace and Happiness' (১৮২০) গ্রন্থ অবলম্বনে প্রাবন্ধিক বিশ্লেষণ করেছেন। তাত্ত্বিক জটিলতাহীন আধুনিক কালের পক্ষে উপযোগী নীতিনির্ভর ধর্মবোধের যে-সন্ধান রামমোহন খ্রিস্টধর্মের মধ্যে করেছিলেন তা স্বাভাবিকভাবেই মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারীদের পছন্দ হয়নি। অধ্যাপক দাশ তাঁর প্রবন্ধে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আধারে প্রসঙ্গগুলি বিশদ করেছেন। এই পর্বের দ্বিতীয় প্রবন্ধে (বিদ্যাসাগর: সংস্কৃত ও ইংরেজি) প্রাবন্ধিক বিদ্যাসাগরের জীবনসাধনার মধ্য দিয়ে সন্ধান করেছেন উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাঙালি তথা ভারতবাসীর আধুনিকতা এবং যথার্থ স্বাদেশিকতা পরিগ্রহণের বিষয়টিকে। প্রবন্ধের উপসংহারে পৌঁছে লেখক তাঁর সমকালের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কালের সংযোগ টানেন

এভাবে—"আজকের ভারতবর্ষে ইংরেজ নেই। কিন্তু চলছে ইংরেজের শাসন, বা বলা ভালো ইংরেজিয়ানার শাসন। বিদ্যাসাগর ছিলেন এরই মূর্ত প্রতিবাদ।... বিদ্যাসাগরও চেয়েছিলেন খোলা দরজা জানালা, ঘরের মধ্যে অবাধ হাওয়ার আসা-যাওয়া, কিন্তু ঝোড়ো হাওয়ায় নিজের ঘর থেকে ছিটকে পড়া, পায়ের তলার মাটি হারিয়ে ফেলাকে চাননি। আজ আমাদের চিন্তার একটা বিরাট সংকট, দেশ ও বিশ্ব, স্বাতন্ত্র্য ও একীকরণ, ঐক্য এবং খণ্ড ইত্যাদি সম্পর্ক নিয়ে। আর আমাদের দেশে এখনও চলছে ভাষা সংকট, সংস্কৃত-ইংরেজি-বাংলার সম্পর্ক নিয়ে সমস্যা। তখন বিদ্যাসাগর আমাদের সামনে উপস্থিত হন, কোনো তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে নয়, তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে, তাঁর প্রাত্যহিক আচরণ ও বিশ্বাস নিয়ে।"

এই পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রথমটি 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল আর অপরটি ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আয়োজিত বঙ্কিম স্মৃতিসভায় পঠিত হয়েছিল। বাইশ বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত/পঠিত রচনা দুটিকে পরস্পরের পরিপূরক বলা চলে। হিন্দুত্ব ও সাম্প্রদায়িকতা, স্বাদেশিকতা, নারীশিক্ষা বা নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নীতি-নৈতিকতার মাপকাঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন অথবা ঔপনিবেশিক পর্বে এবং তারও পরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরিপুষ্টিতে বঙ্কিমের বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বলাবাহুল্য, এই সংক্রান্ত দীর্ঘ বিতর্কের ধারাবাহিকতায় অধ্যাপক দাশের প্রবন্ধ দুটি কোনো ভাবেই চর্বিতচর্বণ হয়ে ওঠেনি। ধর্ম ভিত্তিক সম্প্রদায়গুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস এবং সমকালীন আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সুচারু বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের ও সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের যৌক্তিক ব্যাখ্যা হাজির করতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয় গুচ্ছের ছ'টি প্রবন্ধের প্রথমটি (রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ) লেখা হয়েছিল সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃক হিন্দীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সংকলনের তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা হিসাবে। পরবর্তী রচনাটি (খোলা চিঠি) সংরূপের দিক থেকে অভিনব। বঙ্গীত সাহিত্য পরিষৎ-এর শততম জন্মদিনে অধ্যাপক দাশ পরিষদে উপস্থিত সুধীজনের সামনে তাঁদেরই মধ্যস্থতায় রবীন্দ্র সমীপে 'খোলা চিঠি' প্রেরণ করলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং তার জন্মলগ্নে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ও সাহিত্য পরিষৎ-এর কাছে তাঁর প্রত্যাশা বিষয়ে সামান্য আলাপচারিতা পার হয়ে প্রাবন্ধিক শিশিরকুমার দাশ তাঁর মূল প্রতিপাদ্যে প্রবেশ করেন। বাঙালি আলোচকরা যে প্রসঙ্গটিকে আলোচ্য বলেই প্রায় গ্রহণ করতে চান না, ঔপনিবেশিক আধুনিকতাকে আগে আত্মস্থ করার অহমিকায় ডগমগ হয়ে প্রতিবেশী ভাষা ও সাহিত্যগুলির উপর বাংলা ও বাঙালির আধিপত্য-প্রয়াসকে স্বাভাবিক বলেই মনে করেন তাঁরা। ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক হওয়ার সুবাদেই অধ্যাপক দাশ ভাষা ও সাহিত্যের প্রশ্নে উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালির আধিপত্যকামী মনোভাবকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে। এই পত্র-প্রবন্ধের মতোই আরো একটি পত্র-নিবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েছে প্রবন্ধসংগ্রহের তৃতীয় গুচ্ছে। 'খণ্ডিত দেশ ঃ অখণ্ড কবি' শীর্ষক পত্র-প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের পারস্পরিক দশটি পত্রালাপের মধ্য দিয়ে নজরুলের নির্বাক হয়ে বেঁচে থাকার করুণ পর্ব, ১৯৪৭-এর দাঙ্গা-স্বাধীনতা-দেশভাগ, পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম, কলকাতা থেকে নজরুলের ঢাকায় স্থানান্তরণ এবং দুই পারের দুই রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীতেই রবীন্দ্রনাথের রচনা ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আঙ্গিকের পরীক্ষামূলক অভিনবত্বই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তৃতীয় গুচ্ছে 'খণ্ডিত দেশ : অখণ্ড কবি' রচনাটি ছাড়াও আরো পাঁচটি রচনা রয়েছে। তার মধ্যে 'ইছামতী : প্রতিবাদী-ঐতিহাসিক উপন্যাস'

প্রবন্ধটি পাঠকের মনযোগ দাবি করবে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ-বৈশিষ্ট্যের যে-পাঠ সাহিত্যের রূপরীতি সংক্রান্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় অথবা ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে পাঠকের অভ্যাসগত প্রত্যাশাকে পাশে সরিয়ে রেখে শিশিরকুমার দাশ *ইছামতী* উপন্যাসটির ঐতিহাসিকতা বিচার করতে চেয়েছেন এবং উপন্যাসের অনুচ্চ বয়ানে প্রকাশিত নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজাদের প্রতিবাদের স্বরূপকে বুঝতে চেয়েছেন। ইতিহাস সম্বন্ধে বিভূতিভূষণের ভাবনার বিশিষ্ট প্রবণতাকে উল্লেখ করে প্রাবন্ধিক মন্তব্য করেন—"প্রকৃতপক্ষে 'পথের পাঁচালী'-র লেখক যদি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে চান তাহলে 'ইছামতী' রচনাই তাঁর পক্ষে প্রায়-অনিবার্য।"

মোট বারোটি প্রবন্ধ রাখা হয়েছে চতুর্থ গুচ্ছে। অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশের চর্চাক্ষেত্রের ব্যাপ্তি এবং বিচিত্রগামী আগ্রহের পরিচয় এই পর্বের রচনাগুলিতে পাওয়া যাবে। 'পড়া : রূপ ও রূপায়ণ' শীর্ষক প্রথম রচনাটিতে 'পড়া' ক্রিয়াটির বহুমাত্রিক, জটিল এবং বিচিত্র স্বরূপকে প্রধানত বাঙালির পাঠাভ্যাসের বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বুঝতে চেয়েছেন এবং এই 'পড়া' ক্রিয়াটির সঙ্গে জড়ানো বাঙালির নানা সামাজিক চিন্তাভাবনা ও অভিপ্রায়ের সাহিত্যিক রূপায়ণকে সন্ধান করেছেন। নিঃসন্দেহে এই চর্চা একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণার বিষয় হতে পারে। ভাষাবিজ্ঞান এবং শৈলীচিন্তক শিশিরকুমারের পরিচয় যেমন মূর্ত হয়ে উঠেছে 'আখ্যানের বাক্য' এবং 'নাটকে আখ্যান' রচনা দুটিতে তেমনি নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর গভীর অধ্যাবসায়ের ও অনায়াস দক্ষতার পরিচয়বাহী হয়ে উঠেছে 'দীপায়ন' এবং 'শিল্পীর সন্ধান' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটি। এই পর্বেই সন্নিবিষ্ট হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধসংগ্রহের সবচেয়ে দীর্ঘ 'ভারতীয় রাজনৈতিক উপন্যাস' রচনাটি। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের ভারতীয় সমাজের বহু বিচিত্র আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী এবং সামন্তবাদী-বর্ণবাদী-পুঁজিবাদী শোষণ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী আখ্যানগুলির এমন অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে একমাত্র তাঁর পক্ষেই করা সম্ভব ছিল, তাঁর মৃত্যুর দুই দশক পরেও এই ক্ষেত্রে সম্ভবত তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বীই রয়ে গেছেন।

পঞ্চম তথা শেষ বর্গে স্থান পাওয়া পাঁচটি প্রবন্ধ অ-ভারতীয় সাহিত্যিক ও সাহিত্য বিষয়ক। প্রথম দুটি প্রবন্ধে দুই গ্রিক কবিকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে জন্ম নেওয়া, গ্রিক গীতিকবিতার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 'অগ্নিশিখা' সাফো এবং বিংশ শতাব্দীর সমান বয়সী, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পাওয়া গেঅরগিঅস সেফেরিআদিস ওরফে সেফেরিস---আড়াই হাজারেরও বেশি সময়ের ব্যবধানে থাকা দুজন কবির কবিমানসের স্বরূপ নির্মাণে তাঁর অসামান্য দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। আসলে গ্রিক ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস-পুরাণ এবং সমাজ ও সমাজমন বিষয়ে তাঁর নিরন্তর চর্চাই এক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। এই পর্বের তৃতীয় প্রবন্ধটি (লুকাচের ক্রোধ) *প্রমা* পত্রিকায় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রখ্যাত মার্কসবাদী তত্ত্ববিদ এবং সাহিত্য সমালোচক জর্জি লুকাচ ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে *ঘরে বাইরে* উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে তিক্ত, অসহিষ্ণু এবং অনেকাংশে ভ্রান্ত মূল্যায়ন করেন, অধ্যাপক দাশ তার কারণ সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। জার্মানি সফররত রবীন্দ্রনাথকে 'ব্রিটিশ এজেন্ট' ভাবার মতো মারাত্মক বিভ্রান্তিই লুকাচের ক্রোধের অন্যতম কারণ ছিল বলে প্রাবন্ধিক মনে করেছেন। এই পর্বের শেষ দুটি প্রবন্ধের শিরোনাম যথাক্রমে 'হুইটম্যান ও ভারতীয় সাহিত্য' এবং 'ইরান তোমার যত বুলবুল'। 'হুইটম্যান ও ভারতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে তুলনামূলকতার পথ ধরে এগোলেও শেষে প্রাবন্ধিক পৌঁছে যান কবি হুইটম্যানের অসামান্য রূপমূর্তি নির্মাণে—"তবু হুইটম্যান 'নতুন কাঠ' সংগ্রহ করেছিলেন; আধুনিক কবির কারুকার্যের অন্যতম উপাদান। হুইটম্যান কবি, প্রফেট আর প্রচারক। প্রচারকের কাজ দ্রুত নিঃশেষ হয়। প্রফেটের সর্বজ্ঞতা, ত্রিকালদর্শিতা কাব্যে তত্ত্বকথার সৃষ্টি করে যত সহজে, কবিতা তত সহজে সৃষ্টি করে না। প্রচারক ও প্রফেট হুইটম্যান অনেক সময়েই

আমাদের উদ্বুদ্ধ করে(ন), ...প্রচারক নয়, প্রফেট নয়, ত্রিকালদর্শিতার অহংকার নয়, শুধু মানুষের জীবনের অসংখ্য সুখ দুঃখ, অসংখ্য দীর্ঘশ্বাস, যেখানে রূপের উজ্জ্বলতা, মৃত্যুর ছায়া, যেখানে প্রতি কর্মে প্রতিটি আচরণের মধ্য দিয়ে মানুষকে উপলব্ধি করার চেষ্টা, এমনকী রহস্যময় অন্ধকার পর্দাঢাকা জীবনাতীত সত্যের দিকে উঁকি মারার কৌতূহল—সেই জগতে আমরা তাঁর কাছে যাব, তাঁর ছায়ায় বসব কয়েক মুহূর্তের জন্য।" গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন প্রায় আটশো বছর ধরে ফারসি-বাংলার ভাষিক-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক সংযোগের ক্ষেত্রটিকে। প্রাবন্ধিকের মতে অনুকূল পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ফারসি-বাংলার সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত নির্লিপ্ততাকে অতিক্রম করতে পারেনি। প্রাবন্ধিকের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতে পারবেন না যাঁরা, তাঁরাও অস্বীকার করতে পারবেন না তাঁর আক্ষেপের গভীরতাকে। তাঁর ভাষায়—"আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ফারসি-বাংলা সম্পর্ক, ফারসি সাহিত্যের প্রতি আমাদের সাড়া, মধ্য প্রাচ্যের সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল গভীর চিন্তার বিষয়। কেন আমাদের দ্বন্দ্ব, কেন অপরিচয়। নিমন্ত্রণের রূপকের মধ্য দিয়ে যদি এই সম্পর্ককে বুঝতে চাই তাহলে বলব এ এক এমন নিমন্ত্রণ যাকে বাঙালি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেনি, উপেক্ষা করতে চায়নি হয়তো, কিন্তু উদাসীন থাকতে চেয়েছে। আমাদের সংস্কৃতির বিস্তারের এক সম্ভাবনাকে খর্ব করে দিয়েছে এই উদাসীনতা।"

অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রবন্ধগুলিকে এক মলাটে গ্রথিত করে পৌনে ছয়শো পাতার এই 'প্রবন্ধসংগ্রহ' দেরিতে হলেও প্রকাশ পেয়েছে, এর জন্য দে'জ পাবলিশিং কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানাই। কোনো সম্পাদক/সংকলক না থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই কোনো সম্পাদকীয় ভূমিকা নেই। তবে সম্পাদক/সংকলক না থাকলেও প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পরিবেশনের কাজে আরো যত্নশীল ভূমিকা পালন সম্ভব ছিল বলে মনে হয়। অজয় গুপ্তের প্রচ্ছদ গতানুগতিক এবং তা মোটের উপর বিষয় ও প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলা চলে।

রফিকুল হোসেন

অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Books Accessioned during the Last Month

Asian Section

S
294.334
V295s

Varunavidyarahasyam : Varuna. Emperor of Gods Reigns over cosmic oceans; edited and compiled by Ram Shastri; chiefly edited by Ravishankar Shastri. — Alwar : Rashtriya Adhyatmik Punarjagaran Abhiyan 2021.

311p. : ill : dia : map; 28cm. **(B15694) (Dt. 9.9.21)**

S
294.5921
V414T.s

Vedic Selections, Part-III; edited with Bengali and Eng. translation, explanation and Sayanabhasya by Taraknath Adhikari and Samir Kumar Mondal. — Kolkata : Sanskrit Book Depot., 2020.

viii, 827p.; 22cm. **(B15683) (Dt. 16.8.21)**

Bibliography : p. 809-827

Book for M.A. Class, Rs. 400.00

S
294.5926
D533t
C.1-6

The Dharmaśāstras in Socio-legal perspective; edited by Tapati Mukherjee. — Kolkata; The Asiatic Society, 2021.

xii, 164p.; 22cm. **(B15702-07) (Dt. 29.10.21)**

Contributors : p.162

ISBN : 978-81-951967-8-4 : Rs. 500.00

S
491.25
K18k

Karakatattvasaṁgraha : a collection of some Post Painian Grammatical works on Karaka Relations; edited by Karunasindhu Das. — Kolkata : The Asiatic Society; 2020.

xxvi, 267p.; 25cm. **(B15792, B15797) (Dt. 21.03.22)**

(Bibliotheca Indica Series; no. 340)

Part I : Karakachandrika by Ramchandra Vidyabhusana and Madhumatika by Madhusudana Vachaspati: Two works on Karaka in the Mugdhabodha system; edited by Rita Bhattacharya.

Part II : Satkārakatippani and Karakatattva : Two works on Karakas in the Paninian system; edited by Sumita Chatterjee.

Part III : Katantra Astā dhyādī and Katantra Parisista : works on Karakas in the Katantra system; edited by Silpi Adhikari.

Mention of Karaka in Garudapurana and Agnipurana.

Bibliography : 266-267

ISBN : 978-81-946923-1-7 : Rs. 1000.00

S
520
B813

Brahmasiddhanta in Śākalya samhita; critically edited text, translation, notes and explanation in English by Somenath Chatterjee. — New Delhi : National Mission for Manuscripts, 2019.

viii, 223p.; 25cm. (Prakasika Series; 44) **(B15798) (Dt. 22.03.22)**

Appendix A : Technical Terms : p. 209-213

Bibliography : p. 214-216

Critical Apparatus : p.217

ISBN : 978-93-80829-64-7 : Rs. 600.00

S
520
S693

Somasiddhanta; critically edited text, translation, notes and explanation in English by Somenath Chatterjee. —New Delhi National Mission for Manuscripts, 2021.

viii, 177p.; 25cm. (Prakasika Series; 51) **(B15799) (Dt. 22.03.22)**

Appendix : p.172-175

Biography : p.176-177

S
615.537
S228b.a
C.1-6

Sannipātacandrika; edited

by Brahmananda Gupta and Abichal Chattopadhyay. —Kolkata; The Asiatic Society, 2021.
xxii, 230p.; 22cm. (Bibliotheca Indica Series; no. 341) **(B15783-88) (Dt. 10.03.22)**
Includes index : p.231
ISBN : 978-81-951967-6-0 : Rs. 800.00

S
954
N331p
Nayak, Braj Kishor
Pandit Bhagavat Prasad Tripathi : A monograph on Sanskrit = Bharatiya sahitya ke nirmatā pandit Bhavat Prasad Tripathi/Braj Kishore Nayak. —New Delhi : Sahitya Academi, 2020.
78p.; 22cm. **(B15682) (Dt. 16.08.21)**
ISBN : 978-93-90310-55-5 : Rs. 50.00

Hin
294.493
M239k
Malaiya, Sudha
Kundalpur : Chotebaba Acharya Sri Vidyasagar kā/Sudha Malaiya. —Kundalpur, Madhyapradesh : Basudha Prakashan, 2018.
284p.; ill. (col); 29cm. (Kundalpur Granthamala; 4) **(B15689) (Dt. 09.09.21)**
50th samjam svarna mahotsav ke avasar par.
Rs. 1500.00

Hin
294.493
M239k
Malaiya, Sudha
Kundalpur : Gagan vihar badebaba kā/Sudha Malaiya. —Kundalpur, Madhyapradesh; Basudha Prakashan, 2018.
238p.; ill. (col); 29cm. (Kundalpur Granthamala; 3) **(B15691) (Dt. 09.09.21)**
50th samjam svarna mahotsav ke avasar par.
Rs. 1500.00

Hin
294.493
M239k
Malaiya, Sudha
Kundalpur : Badebaba Adinath Kā/Sudha Malaiya. —Kundalpur, Madhyapradesh; Basudha Prakashan, 2018.
367p.; ill. (col); 29cm. (Kundalpur Granthamala; 1) **(B15690) (Dt. 09.09.21)**
50th samjam svarna mahotsav ke avasar par.
Rs. 1500.00

Hin
294.493
M239k
Malaiya, Sudha
Kundalpur : mahamastakābhisek Badebaba ka/Sudha Malaiya. —Kundalpur, Madhyapradesh; Basudha Prakashan, 2018.
335p.; ill. (col); 29cm. (Kundalpur Granthamala; 2) **(B15692) (Dt. 09.09.21)**
50th samjam svarna mahotsav ke avasar par.
Rs. 1500.00

Hin
615.53703
V414s
Vedik Medicine Encyclopaedia=Vedaoshadhi Kalpataru; edited and compiled by Ram Shastri; chiefly edited by Ravishankar Shastri. —Alwar : Rashtriya Adhyatmik Punarjagran Abhiyan, 2020.
430p.: ill.; 22cm. **(B15687) (Dt. 09.09.21)**

Hin
732.44
B575s
Bharatiya murtikala; edited by Jayakisandas Sadani; co-edited by Bittaldasa Mundhra; chiefly edited by Rameshchandra Sharma. —Kolkata : Bharatiya Sanskriti Samsad, 1917.
xii, 178p.: 46p-os pls; 25cm. **(B15727) (Dt. 01.11.21)**
Rs. 350.00

Sant
923.0954
V648b
Vidyasagar Chayachalan : Rabindranath Takur āāh al puthi, Vidyasagar charit reyeh olchiki tarjama/by Bado Baske. —Kolkata : The Asiatic Society, 2020.
50p.; 22cm. **(B15593-B15598) (Dt. 02.02.21)**
In Olchiki script
ISBN : 978-81-941437-8-9: Rs. 80.00

Sant
923.0954
V648b
Vidyasagar Chayachalan : Rabindranath Takur āāh al puthi, Vidyasagar charit reyeh Santali tarjama/by Bado Baske. —Kolkata : The Asiatic Society, 2020.
52p.; 22cm. **(B15587-B15592) (Dt. 02.02.21)**
Text in Bengali script.
ISBN : 978-81-941437-9-6: Rs. 80.00

Our latest arrival

CONTENTS

ARTICLES

Descriptions of Fauna in the *Ṛgveda* : A Treasure for Zoological Sciences
K. G. Sheshadri 1

Western Philosophy : To the context of "Infidel Zero" and the dilemma of "Infinity"
Kanta Prasad Sinha 45

Decoding Honour — Mukhtar Mai : The Voice of Dissent
Ajanta Biswas and Kamalika Majumder 73

Institutionalising Efficiency: Debating the Age of Retirement in Late Nineteenth Century Colonial India
Poorva Rajaram 95

Technical and Engineering Education in India in the Nineteenth Century: The Bengal Engineering College, c. 1840s-1890s
Sunayana Maiti and Sujata Banerjee 123

Dialectics of Axiological Valence: Exploring the Issues of Value-System as the Site of Cross-Cultural Conflict in R. K. Narayan's *Swami and Friends*
Pushpen Saha 141

Cognitive Linguistic Support for Historical Linguistic Facts: A Comparative Semantic Study of Hindi-Bangla-Maithili 'come'
Sanjukta Ghosh 163

GLEANINGS FROM THE PAST

On the Swayamvara of the Ancient Hindus, and its traces in the ancient world generally
E. B. Cowell, M. A. 181

NOTES ON GLEANINGS

Tradition Rejuvenated: An Ancient Indian Custom Epitomising Women Empowerment and its Parallels in Ancient World Literature
Tapati Mukherjee 191

BOOK REVIEW

Chandrika Kaul (ed.), *M. K. Gandhi, Media, Politics and Society*, Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020.
Arun Bandopadhyay 193

Meeta Deka (ed.), *Urbanisms in South Asia: North-East India Outside In*, New Delhi : Primus Books, 2020.
Mahalaya Chatterjee 199

Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity ...

Freedom and power bring responsibility. The responsibility rests upon this Assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom we have endured all the pains of labour and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over and it is the future that beckons to us now.

That future is not one of ease or resting but of incessant striving so that we may fulfil the pledges we have so often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over.

Extract from 'Tryst with Destiny'

Published by Dr. Satyabrata Chakrabarti, General Secretary, The Asiatic Society, 1, Park Street, Kolkata 700016,
Phone: 2229 0779, 2229 7251, 2249 7250 E-mail : gs.asiatic@gmail.com
Web: www.asiaticsocietykolkata.org
Printed at Arunima Printing Works, 81, Simla Street, Kolkata 700 006. E-mail : arunimaprinting@gmail.com